প্রথম সংস্করণ । ১০ই অক্টোবর, ১৯৮২

প্রচ্ছদ । সমরেশ মুখোপাধ্যায়

নব সাহিত্য প্রকাশনী ১২৮/১এ, রাজা রামমোহন সরণী
কলকাতা ৯ হইতে শ্রীমতী চন্দনা ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত
ও সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত এবং অঙ্কুর ৪৪-বি, সূর্য সেন
স্ট্রীট, কলকাতা ৯ হইতে কৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

## আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ

অনুবাদ

লু স্যুনের নির্বাচিত প্রবন্ধ ॥ দশ টাকা

লু স্যুনের কবিতা বুনো ঘাস ॥ পাঁচ টাকা

চীনের কালজয়ী কিশোর গল্প ॥ দশ টাকা

চীনের প্রাচীন সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ॥ দশ টাকা

চৌ এন লাই-এর কবিতা ও শিল্প-ভাবনা ॥ পাঁচ টাকা

সম্পূর্ণ উপন্যাস

দুই ঠিকানা ॥ শংকর চট্টোপাধ্যায় ॥ বারো টাকা

কাব্যগ্রন্থ

দিগন্ত ॥ অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ॥ ছয় টাকা

শব্দের অন্তরে ॥ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ পাঁচ টাকা

# সম্পাদকের কথা

ম্যাক্সিম গোর্কিকে লেখা বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও মনীষী রম্যা রলাঁর একটি চিঠির অংশ বিশেষ দিয়ে শুরু করা যেতে পারে।

'…এক শীতের ভাটার টানে আপনার আবির্ভাব, যখন মহাবিষুবের লক্ষ্যে সবে বসন্তের মৃদু পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এই কাকতালীয় ঘটনাটি আপনার জীবনে গভীর অর্থবহ কারণ জীর্ণ-পুরাতন পৃথিবীতে জন্মেও নতুন বিশ্বের সঙ্কেত-ঝড়ে আপনি ক্রমবর্ধমান হয়েছেন। অতীত ও বর্তমান —দুই পৃথিবীর যোগসূত্রে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন দীর্ঘ এক সেতুর মত। আমি সেতুটিকে অভিনন্দন জানাই। এ সেতু আকাশচুম্বী। আমাদের নতুন প্রজন্ম যুগে যুগে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে এই সেতুর দিকে তাকিয়ে থাকবে… ।'

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে নিঝনি-নভোগর্দের শ্রমিক আলেক্সি পেশকভ যখন ম্যাক্সিম গোর্কি ছদ্মনামে প্রথম গল্প লেখেন, তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ। ইতিমধ্যেই বিচিত্র জীবন ও জীবিকার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর পাঠশালায় যে রুক্ষ, তিক্ত ও সুগভীর অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছিলেন, বিশ্বের খুব কম লেখকের ভাগ্যেই তা ঘটে। ম্যাক্সিম গোর্কির জীবন অগণিত পাঠকের কাছে সুবিদিত। শুধু একটি বিশেষ ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যা গভীর তাৎপর্যবহ। উনিশ বছর বয়সে, গোর্কি যখন কাজানে এক রুটি কারখানার শ্রমিক, লেনিনের নেতৃত্বে সেখানে এক ছাত্র-বিদ্রোহ ঘটে। এই বিদ্রোহ দমন করতে, ছাত্রদের 'পর আসুরিক বলে চড়াও হয় কাজানের রুটি-শ্রমিকরা, গোর্কি যাদের গভীর আস্থা নিয়ে বোঝাতেন সমাজ পরিবর্তনের কথা। গোর্কির আস্থাভাজন এই শ্রমিকরা যখন এই ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হয়, দুঃখে বেদনায় গোর্কি কাজাঙ্কা নদীর তীরে নিজের বুকে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন। সুখের বিষয়, গুলি তার ফুসফুস বিদ্ধ করতে পারেনা এবং গোর্কিকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করলে, ঐ শ্রমিকরাই গভীর ভালোবাসা ও মমতা নিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ায়। ঐ সব শ্রমিকদের

মধ্যে গোর্কি লক্ষ করেন আগামী দিনের ইতিহাস। দেখতে পান সামাজিক পরিস্থিতি কেমনভাবে মানুষকে পশুত্বে পরিণত করে। সুতরাং জীবন-ধারার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এ অভিজ্ঞতা তাঁকে নতুন কর্মে নিয়োজিত করে, জীবনের এই বিপুল অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি স্থির থাকতে পারেন না, বাধ্য হন কলম ধরতে।

শুরুতে তিনি প্রধানত ভল্গা অঞ্চলের কাগজপত্রেই লিখতেন এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে গোর্কির প্রথম গল্পগ্রন্থ Sketches and Stones যখন প্রকাশিত হয়, রাতারাতি সারা দেশের পাঠক নতুন প্রতিভায় চমকে যায়। এর পর উপন্যাস Foma Gordeyev, The Three এবং নাটক The Lower depth প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার খ্যাতি দেশ-কালের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্ব সাহিত্যের আঙিনায় পৌঁছে যায়। গোর্কির Foma Gordeyev, টলস্টয়ের Resurrection এর মতই সমানভাবে রুশদেশে আলোড়ন ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল।

গোর্কির এই প্রথম পর্বের লেখায় একদিকে আমরা পাই সরল মানবিকতা, শ্রমিক, ভবঘুরে, পতিতা—রাশিয়ার জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশের দুঃখ-যন্ত্রণা, বঞ্চনা, হতাশা ও শোষণের ছবি, অন্যদিকে মালিক, ব্যবসায়ী, বিত্তবানদের স্থূল, লোভী ও সর্বগ্রাসী লুঠ ও ক্ষমতার চিত্র। এইসব চরিত্রগুলো গোর্কি এত গভীর ও আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, নাটক, উপন্যাস ও গল্পে তা জীবন্ত হয়ে উঠলো। My Travelling Companion, Twentysix men and a girl, Konovalov, Kolusha প্রভৃতি প্রথম পর্বের গল্পে এ ছবিগুলোই সুস্পষ্ট।

বিংশ শতাব্দীর সূচনায়, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে, The Three উপন্যাসের মধ্য দিয়েই গোর্কির নতুন জীবন-দর্শন ও সাহিত্যের সূচনা লক্ষ করা হয়। তাঁর প্রথম পর্বের গল্প Old Izergil এর রূপকাহিনীই বাস্তব পৃথিবীতে The Three এর মধ্যে সঞ্চারিত হল। নতুন পৃথিবীর অস্পষ্ট আভাস পাওয়া গেল এই উপন্যাসের মধ্যে। এরই স্পষ্ট, চূড়ান্ত রূপ হিসেবে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হল Mother। Mother উপন্যাসের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা এখানে থাক, পৃথিবীর আর কোন উপন্যাস এভাবে সমাজকে আলোড়িত করেনি। দেশে দেশে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠেনি।

প্রথম পর্বে গোর্কি শ্রমিকশ্রেণীর শোষণ-বঞ্চনা সুষ্ঠুভাবে চিত্রিত করলেও, শ্রেণী হিসেবে শ্রমিকদের ক্ষমতা ও আগামী দুনিয়ার নিয়ন্তা হিসাবে,

জনগণের বিবেকের প্রহরী হিসেবে, শ্রমিকদের লুকোয়িত শক্তির সন্ধান পাননি। সে জন্যই গোর্কি'র সাহিত্য-জীবনে Mother বিশিষ্ট স্থান অর্জন করে আছে। সরল মানবিকতা থেকে গোর্কি উত্তীর্ণ হন শ্রেণী-মানবিকতায়। যখন মা সোচ্চারে বলার ক্ষমতা অর্জন করেন—'They can't kill my spirit—my living spirit'!

গোর্কি'র দৃষ্টিভঙ্গির এই গভীরতা ও নবরূপ আনয়নে রাশিয়ায় ১৯০৫-এর অসমাপ্ত বিপ্লব অন্বিত হয়ে যায়। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গোর্কি'র বিশ্ব-দৃষ্টি ও দার্শনিক বোধের দুটো সুস্পষ্ট মতামত আমরা পাই। তিনি বিশ্বাস করেন বিপ্লবী পরিস্থিতির মধ্যে জনগণের সঙ্গে একাত্ম হলেই আত্মার পুনর্জাগরণ ঘটবে, বিপরীতে, সামাজিক ও ঐতিহাসিক ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় 'বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিস্বাদ'। Mother উপন্যাস প্রথম ধারার ফসল, দ্বিতীয় ধারায় তিনি সৃষ্টি করেন বিশ্ব-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস Life of Klim Samghin। চারখণ্ডে লিখিত এই উপন্যাসে গোর্কি দেখিয়েছেন 'সামঘিন-বাদ' কিভাবে মানুষের আত্মিক মুক্তি ও পুনর্জাগরণে বাধা সৃষ্টি করে।

এই শ্রেণী-মানবিকতাবাদই পরবর্তিকালে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার জন্ম দেয়। সাহিত্যধারায় এই দ্বিতীয় পর্বে গোর্কি'র অন্যতম উল্লেখযোগ্য গল্প A man is Born, The Creepy Crawlies, First Love; উপন্যাস The Artamonovs, আত্মজীবনীমূলক Trilogy উপন্যাস এবং নাটক।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে, বিপ্লবের পর, লেনিনের উপদেশে গোর্কি ইতালিতে বিশ্রাম করতে যান। ক্ষত ফুসফুস তার স্বাস্থ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করছিল। এই পর্বেই সৃষ্টি হয় Tales of Italy। গোর্কি'র স্বাস্থ্যের ক্রমঅবনতি ঘটতে থাকে কিন্তু নতুন সোভিয়েত গঠনে তার পরিশ্রম চতুর্গুণ বেড়ে যায়। শুধু গল্প, উপন্যাস নয়, সাংবাদিকতা থেকে শুরু করে নতুন লেখকসৃষ্টির দায়িত্ব, লেখকসংঘ গঠন, সোভিয়েতে নানা জাতির সাহিত্য-বিকাশে গোর্কি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ১৯২৮ এর পর স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি ঘটলে প্রতিবছর ইতালির আবহাওয়ায় কিছু দিন কাটিয়ে আসতে যান কিন্তু ১৯৩৩ এর পর পাকাপাকি সোভিয়েতেই বসবাস শুরু করেন। ইতিমধ্যে জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয়ে গোর্কি বিশ্বের শান্তিপ্রিয় ও সুস্থ বিবেক-সম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্যের কোন উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় না। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে গোর্কি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তাঁর শেষ কথা উচ্চারিত হয়েছিল 'There'll be wars···We must be prepared!···'Old Izergil-এর Donko চরিত্রটির মতই তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন।

সীমিত আর্থিক ক্ষমতায় নব সাহিত্য প্রকাশনী গোর্কির শ্রেষ্ঠগল্প প্রকাশে ব্রতী হয়েছেন। এর আগে লু স্যুন-এর প্রবন্ধ ও কবিতার সংকলন এরা প্রকাশ করেন। প্রকাশনার জগতে এ এক সুস্থ লক্ষণ। শ্রেষ্ঠগল্প বিচারে সর্বকালেই দ্বিমত থাকা স্বাভাবিক। এ স্বাধীনতা প্রকাশকের। তবে এ সংকলনে গল্প বাছাইয়ে যে ধারা অনুসৃত হয়েছে তা হল গোর্কির প্রথম পর্বের সাহিত্য অর্থাৎ সরল মানবতাবাদ-এর কিছু গল্প এবং দ্বিতীয় পর্বের উল্লেখযোগ্য কিছু গল্প যেখানে গোর্কি শ্রেণী-মানবতার পথ ধরে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার দিকে চিন্তা ও মননকে প্রসারিত করেছেন।

প্রথম পর্যায়ে পড়ে, Song of falcon, Twentysix men and a girl, Poet, Reader, Kalusha ইত্যাদি, দ্বিতীয় ধারায় আছে, A man is born, Creepy Crawlies, Comrade, First love ইত্যাদি। গল্পগুলো অনুবাদ করেছেন সমর ঘোষ। অনুবাদ সাহিত্যে সমর ঘোষ ইতিপূর্বে বেশ কিছু কাজ করেছেন যা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণীয়।

পাণ্ডুলিপি সাজানো-গোছান এবং বিভিন্ন সময়ে প্রুফে ও পরামর্শে সাহায্য করেছেন জয়শ্রী ঘোষ, অমল চক্রবর্তী, শ্যামল মৈত্র, অরুণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এছাড়া বিশেষ করে সাহায্য করেছেন 'অঙ্কুর' প্রেসের মৃণাল বিশ্বাস, কৃষ্ণ বোস ও কর্মীবৃন্দ। গোর্কির সাহিত্যের সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠক কিঞ্চিৎ পরিচিত হলেও নতুন প্রজন্মের কাছে এমন একটি গল্প সংকলনের প্রয়োজন ছিল। নব সাহিত্য প্রকাশনী এ ব্যাপারে সহযোগিতার হাতে এগিয়ে এসেছেন, আশা করি গ্রন্থটি পাঠক সমাজে বহু দিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে।

# জীর্ণ-বিকল

গ্রীষ্মের এক অসহ্য রাত। শহরতলীর নির্জন রাস্তার অদ্ভুত ঘটনাটা আমার নজরে পড়েছিল।

জনৈক স্ত্রীলোক পচা ডোবার পাঁকে পা ডুবিয়ে নাচছে, কাদা ছুঁড়ছে আর স্খলিত-কণ্ঠে গাইছে অশ্লীল গান। বিকেলের প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির পর রাস্তা-ঘাট কর্দমাক্ত। উপরন্তু ডোবাটা গভীর বলে স্ত্রীলোকটির হাঁটু অবধি ডোবা। আওয়াজ শুনে মনে হয় ও মাতাল। এ ভাবে নেচেকুঁদে শ্রান্ত হয়ে পড়লে, গড়িয়ে পাঁকে ডুবে মরা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই দ্রুত পায়ের বুটটা খুলে আমি সরাসরি কাদার মধ্যে নেমে এলাম। হাতদুটো টেনে ডাঙ্গায় তুলে আনতে মুহূর্তের বিহ্বলতায় চুপটি মেরে থাকলেও সহসা এক ঝটকায় হাত-দুটো ছাড়িয়ে নিল। বুকে একটা ধাক্কা দিয়েই বিকৃত গলায় বলল, 'উপকার!' এবার সে আমাকে টানতে টানতেই নেমে গেল ফের ডোবাটার মধ্যে। গজ গজ করে উঠল, 'গোল্লায় যা! আমি উঠব না। তোকে ছাড়াই আমার চলবে··· তুই নিজের পথ দেখ···উপকার করতে এসেছে।'

রাস্তার চৌকিদারটা হঠাৎ কোন এক অন্ধকার অংশ থেকে ঝুপ করে সামনাসামনি দাঁড়াল। রুক্ষ গলায় হাঁক ছাড়ল, 'এত হৈচৈ কিসের?' ডুবে মরার হাত থেকে ওকে উদ্ধারের কথা বলতেই, সে স্ত্রীলোকটার দিকে তীক্ষ্ন নজর দিয়ে একদলা থুতু ফেলে বলল,—'উঠে আয় মাশকা।'

'না—'

'ওঠ···ওঠ বলছি—'

'উঠব না—'

'বিনা পিটুনিতে তুই উঠবি না মাগী'—দাঁতে দাঁত ঘষে কথাকটি বলেই মৃদু হেসে আপনজনের মত আমাকে বলল, 'পাশের বস্তিতে থাকে···কাগজ কুড়োয়···মাশকা কালিখা নাম···তুমি খুব হাঁপিয়ে গেছ মনে হচ্ছে?' পরস্পর

আমরা সিগরেট ধরালাম। স্ত্রীলোকটি পাঁকের মধ্যে নাচাকুঁদো করে চেঁচিয়েই যাচ্ছে, 'মাতব্বরি করতে এসেছে ! কারও সাহায্যের দরকার নেই। দরকার হলে কাদায় ডুব দেব আমি।'

'এবার কিন্তু চুলের মুঠি ধরে চুবোব'—চৌকিদার সাবধান করে দিল। তার চেহারাটা গাট্টা-গোট্টা, মুখে একগাল দাড়ি, বয়স প্রায় পঞ্চাশের ওপর।

'প্রতি রাতে রাস্তায় এমন মাতলামি ! বাড়িতে যে খোঁড়া ছেলেটা হাঁপিয়ে মরছে, খেয়াল আছে…?'

'ঘরটা কত দূরে ?'

আমার এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কিসের এক চাপা উত্তেজনায় বলল, 'মেরে ফেলাই মাগীটার উপযুক্ত শাস্তি।'

'যাক, ওকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় কি করে ?'

আমার এ কথায় চৌকিদারটি কিসের সন্দেহে দাড়ির গোছা মুঠোয় চাপতে চাপতে, আমার প্রতি বক্রদৃষ্টি হেনে কাদা ভেঙে আপন কর্তব্যে চলে গেল। শুনতে পেলাম বলছে, 'ইচ্ছে হচ্ছে যখন নিয়ে যাও। —সব কিছুর আগে মুখের দিকে তাকিয়ে নিও একবার।'

পাঁকে বসে স্ত্রীলোকটি তখন হাত দুখানা দুদিকে দোলাচ্ছে আর কাঁপা-গলায় চেঁচাচ্ছে, 'দাঁড় বাইছি—সমুদ্রে—সমুদ্রের মধ্যে।'

অন্ধকার আকাশে রাস্তার নোংরা জলে তারার ছায়া। একটু নাড়া-চাড়া হতেই সে ছায়া মিলিয়ে যায়। আমি ফের পাঁক ঠেলে, স্ত্রীলোকটিকে পাঁজাকোলা করে, হাঁটুর মৃদু ধাক্কায় ডাঙায় তুলে আনলাম। সে বাধা দিল, হাত পা ছুঁড়ল, শেষে শরীরটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'মার আমাকে, আরো মার। ভয় পাই বুঝি ! জানোয়ার…হতচ্ছাড়া…আয় মার আমাকে।' আমি টেনে তুলে, দাঁড় করিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলাম তার বাড়ির কথা। সে একবার নেশাগ্রস্ত মাথাটা তুলে ধূসর-ঝাপসা চোখে আমার মুখের দিকে তাকাল। নাকের বাঁশিটার ক্ষয়িষ্ণু অগ্রভাগ শুধু জেগে আছে বোতামের মত। উপরের ঠোঁটটা স্থায়ী একটা ক্ষতের জন্য কুঁকড়ে ঠেলে ওঠায়, বেরিয়ে আছে

একপাটি সরু দাঁত। গোলগাল ছোট্ট মুখখানা আমার দিকে মুহূর্তের দৃষ্টি বিনিময় করে বলল, 'বেশ···চলে এস'। আমরা পাশাপাশি চলতে লাগলাম। ওর স্কার্টের ভেজা প্রান্ত আমার পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল।

'চলে এস প্রিয়তম'—তার গলাটা ফ্যাসফ্যাসে—চেষ্টা করে মোলায়েম করে তুলছে। 'ভালই লাগবে তোমার···আমার কাছে শান্তি মিলবে।'

সে আমাকে মস্ত এক দোতলা বাড়ির উঠোনের সামনে নিয়ে এল। ইতস্তত ছড়ান ঠেলাগাড়ি, পিপে, প্যাকিং-বাক্স, কাঠের স্তূপের ঘাপ-ঘুপচির মধ্যে দিয়ে, নিঃশব্দে, অন্ধের মত স্ত্রীলোকটি একতলার এক অন্ধকার গুহার সামনে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল।

'নেমে এস।'

ভাঙাচোরা দেয়ালে ভর দিয়ে, অন্য হাতে টলে-পড়া ওর দেহটাকে সামলে আমি পিচ্ছিল সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলাম। হাতড়ে হাতড়ে পর্দার কাছে দরজার কড়া পাওয়া গেল। ধাক্কা দিতেই একতাল ঘন অন্ধকার; আর যাওয়া উচিত কিনা ইতস্তত করতেই, গভীর অন্ধকার থেকে ক্ষীণ স্বরে ভেসে এল, 'কে? মা নাকি?'

'আমি—'

সহসা ভ্যাপসা, পচা দুর্গন্ধ নাকে ভেসে এল। দিয়াশলাই-এর কাঠি জ্বালার শব্দ হতেই ক্ষীণ আলোক-শিখায় একটি শিশুর পাণ্ডুর মুখ চকিতে চোখের সামনে ভেসে উঠল।

'আর কে আসবে?···আমিই'—স্ত্রীলোকটি আমার কাঁধে ভর করে ওকে শুনিয়ে শুনিয়েই জবাবটা দিল।

আবার একটা জ্বলন্ত দিয়াশলাই-এর কাঠি। আলোতে দেখা গেল অস্থি-চর্মসার একটি ছোট্ট হাত চিমনি-ঢাকা ছোট্ট কুপিটি জ্বালাচ্ছে।

'আমার বাছাধনরে!'—বলেই স্ত্রীলোকটি টলতে টলতে ঘরের কোণায় ধপাস করে শুয়ে পড়ল। ওখানে মেঝেতে তৈরী আছে ছেঁড়া কাপড়-চোপড়ের মস্ত এক বিছানা। ছেলেটি কুপির পলতে বাড়িয়ে দিতেই আলোটা ধূমায়িত

হয়ে আরও উজ্জ্বলভাবে জ্বলতে লাগল। ওর মুখখানা বিষণ্ণ, তীক্ষ্ণ-নাসা; ঠোঁটজোড়া ঠিক মেয়েদের মত, যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা। আশ্চর্যের বিষয়, এমন এক স্যাঁতসেঁতে অন্ধ-বিবরে এ মুখ বেমানান। আলোটা উস্কে দিয়েই, সে আমার মুখে কুণ্ঠায় দৃষ্টিতে তাকাল।

'আজও কি মাতাল হয়ে এসেছে ?'

ওর মা তখন বিছানায় চিৎপাত হয়ে ফোঁপাচ্ছিল, কখনো বা নাকে তুলছিল আওয়াজ।

আমি বললাম, 'ওর কাপড়-চোপড় ছাড়ান দরকার।'

চোখজোড়া মুদু নামিয়ে ছেলেটি বলল, 'বেশ তাই করুন।'

আমি যখন স্ত্রীলোকটির ভেজা কাপড় ছাড়াতে ব্যস্ত, ছেলেটি ফিস্‌ফিস্ করে যেন প্রতিদিনের অভ্যাসবশে জিজ্ঞেস করল, 'আলোটা নিভিয়ে দেব কি ?'

'কেন ?'

কোন জবাব দিল না সে। ময়দার বস্তার মত দেহ থেকে ভেজা কাপড় ছাড়াবার ফাঁকে ফাঁকে আমি ছেলেটির দিকে নজর রাখছিলাম। সে তখন জানলার কাছে একটি প্যাকিং-বাক্সের ওপর মুখ ঘুরিয়ে বসেছিল, পিছনের দিকে তাকাচ্ছে না। বাক্সটা মোটা কাঠের এবং গায়ে কালো কালো অক্ষরে লেখা—

'সাবধানে নাড়াচাড়া করিবেন'

এন, আর এণ্ড কোং

ছেলেটির কাঁধের সমতলেই জানলাটা। দেয়ালের গায়ে সারি সারি ছোট তাক। সিগরেট এবং দিয়াশলাই-এর খালি বাক্সে ভরা। মনে হল বসার জায়গার পাশেই হলুদ কাগজে-মোড়া অন্য একটি প্যাকিং-বাক্সকে সে টেবিল হিসেবে ব্যবহার করে। অসহায় হাতজোড়া দিয়ে গলাটা পেঁচিয়ে ধরে সে জানালা দিয়ে দূরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়েছিল।

ইতিমধ্যে ভেজা কাপড়-জামা উনুনের দিকে ছুঁড়ে, দরজার কোণের একটা মাটির হাঁড়ির জলে হাত ধুয়ে, রুমালে পুঁছতে পুঁছতে বললাম, 'বেশ, তবে চলি।'

আমার দিকে তাকিয়ে সে আধো-জড়ান স্বরে বলল, 'এবার কি আলো নেভাতে হবে ?'

'তোমার খুশি।'

'চলে যাচ্ছেন? বিস্মিত গলায় অশ্চর্যসার হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ওখানে···ওই বিছানায়···শোবেন না মার সঙ্গে ?'

রূঢ়ভাবে বললাম, 'কেন ?'

সরলভাবে ছেলেটি বলল, 'আপনিই জানেন···সকলে শোয় কি না।'

উত্তেজনায় চারপাশে দৃষ্টি বোলাতে লাগলাম। ডানদিকে কিম্ভূতকিমাকার একটা উনুন, সামনেই কিছু ময়লা বাসন-পত্তর, এককোণে প্যাকিং-বাক্সের পিছনে, ছেঁড়া কিছু দড়ির টুকরো, একস্তূপ ফেঁসো, কাঠের টুকরো এবং একটা লাঙ্গলের কাঠ। পায়ের অদূরেই পড়ে আছে নাসিকাগর্জনরতা একটা হলদেটে শরীর।

আমি ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার পাশে বসতে পারি ?'

গোমরা-মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মা কিন্তু ভোরের আগে আর উঠবে না, শুনে রাখুন।'

'ছেড়ে দাও। কোন দরকার নেই তাকে।'

তার প্যাকিং-বাক্সের পাশে বসে, আমি শিশুটিকে বলছিলাম তার মায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের কাহিনীটি। আমার কথাগুলোর মধ্যে ছিল সরস ভঙ্গি। ছেলেটি মাথা দুলিয়ে মৃদু হাসতে হাসতে, ছোট্ট বুকটা চুলকে বলে উঠল, 'ও যে তখন মাতাল।···ভাল অবস্থাতেই কত মজার মজার কাজ করে···ঠিক ছোট্ট একটা মেয়ের মত।'

'কাদায় বসে নৌকা চালাবার ভঙ্গি, যেন সত্যিসত্যিই সে গান গাইছে আর দাঁড় বাইছে।'

কাছাকাছি, পরিষ্কার নজরে পড়ল তার দীর্ঘ পল্লবের আয়ত চোখ-জোড়া। নীলাভ, বিবর্ণ দেহের জন্য তা আরও উঁচু। উজ্জ্বল কপাল, লালচে ঘন-কুঞ্চিত চুলে মাথাটি ঢাকা। তার চোখের চাউনি শান্ত এবং একাগ্র।

গভীরতা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তবুও আমার প্রতি তার একটা অমানবিক দৃষ্টি আমি গায়ে মাখছিলাম না।

'তোমার পা-জোড়া অমন কেন?'

ঢাকা-কাঁথাটা হাতড়ে-হাতড়ে কাঠির-মত-সরু একজোড়া পা বের করে, হাতে তুলে প্যাকিং-বাক্সের উপর রাখল।

'জন্ম থেকেই এ দুটো এরকম। হাঁটিতে জানে না, শুকনো। কোন কাজেই লাগে না আমার।'

'বাক্সগুলো কিসের জন্য?'

'ও আমার পতঙ্গশালা—'

কাঠির মত পা-জোড়া তুলে ফের কাঁথায় ঢেকে, বাক্সের নীচে ঝুলিয়ে রাখল। প্রশ্নটায় সহসা তার মুখমণ্ডল বন্ধুত্বের হাসিতে ভরে উঠল।

'দেখবেন আপনি?···একটু ঠিক হয়ে বসুন। এ জিনিস জীবনে কোথাও দেখেননি।'

সরু, লম্বা হাতজোড়া নিয়ে কৌশলে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে দেয়াল ধরে উঁচু হয়ে হয়ে সে একে একে বাক্সগুলো রাখতে লাগল।

'সাবধান! খুললেই কিন্তু ওগুলো পালাবে। কানের কাছে ধরুন; সুন্দর শব্দ শুনছেন না?'

'কি যেন নড়াচড়া করছে—'

'ঠিক। একটা মাকড়সা। খুব চালাক···ওর নাম ড্রামার।'

সুন্দর চোখজোড়া চকচক করতেই, মুখে হাসি ফুটে উঠল। দ্রুত দেয়াল-আলমারি থেকে কয়েকটা বাক্স তুলে নিজের কানে পরখ করে আমার কাছে তুলে ধরল। চঞ্চল হয়ে বলল, 'দেখুন, একটা আরসোলা। ওর নাম এ্যানিসিম···কি রকম বড়াই দেখুন ওর, ঠিক যেন একটা সৈন্য।···এ বাক্সটা মাছির, শ্রীমতী আফসাল···অতি বাজে জীব। প্রত্যেকের কাছে দিনরাত ভন্‌ভন্ করে, এমনকি মায়ের মাথার কাছেও ঘোরে।···এটা মাছি না, নাম মিসাস, রাস্তার ধারে থাকে, দেখতে মাছির মতই।···এটা কালো কাঁচপোকা,

মস্ত বড়। ওর নাম রুস, খুব খারাপ নয় এটা।…তবে একটু মাতাল, আর লজ্জা-ঘেন্না বলতে ওর কিছু নেই। খুব মদ-টদ খেলে উঠোনে গড়াগড়ি খায়…কেমন লোমে ঢাকা, ঠিক কাল কুত্তার মত।…এটা একটা গুবরে-পোকা …নিকোডিম খুড়ো। এটাকে আমি বাইরে ধরেছিলাম। কেমন ট্যাপা-টোপা, ঠিক যেন একটা সাধু গীর্জা বানাবার পয়সা তুলবার জন্য ঘুরছে। মা ওর নাম দিয়েছে চিপসকেট। খুব পছন্দ করে ওকে। মার অবিশ্যি অনেক পিয়ারের লোক আছে…দিনরাত নাকের কাছে ঘুর ঘুর করছে…ওই করে নাকাটা তো ক্ষয়েই গেছে।'

'মা তোমাকে পিটোয় ?'

'মা ? কখনই না। আমাকে ছাড়া সে থাকতেই পারে না। ভিতরটা খুব নরম। কেবল একটু মাতাল এই যা! বস্তির সবাই তো মাতাল।… শুঁড়িখানা আর বেশ্যা-লম্পটদের আস্তাবল করে তুলেছে। আমিও মাকে বলি মদ খাওয়া ছাড়ো। দেখবে বড়লোক হয়ে যাবে। আমার কথা শুনে হাসে। বোকার কাছ থেকে আপনি কি আশা করেন ?…কিন্তু ওর মনটা খুব ভাল, ঘুম থেকে উঠলেই বুঝতে পারবেন।'

তার ছোট্ট, মধুর আকর্ষণীয় হাসিটুকুতে আমার হৃদয় এমন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল যেন এ শহরের সমস্ত মানুষদের চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে, 'শোন ধৈর্য ধরে, আমার হৃদয়ের ধ্বনি শোন।' অজানা এক ফুলের মত তার ছোট্ট মাথাটি দুলতে লাগল, চোখজোড়া জীবনীশক্তিতে আরও ভাস্বর—যা আমাকে অজানা বিপুল আকর্ষণে টানতে থাকে।

শিশুসুলভ কিন্তু গভীর অর্থবহ কথাগুলো শুনতে শুনতে স্থান-কাল-পাত্র গেলাম ভুলে। হঠাৎ খেয়াল হল আমার সামনে ছোট্ট জানালা, বাইরে কাদা-লেপা-উনুনের কালো গর্তটা, কোণায় ছড়ান নোংরা বাসনপত্র এবং দরজার একপাশে কাঁথার বিছানায় তেলচিটচিটে হলদে এক তাল মাংসের মত ঘুমন্ত মায়ের দেহটা।

'সংগ্রহশলাটা সুন্দর না ?'—ছেলেটি গর্বের স্বরে জিজ্ঞেস করল।

'খ্‌—ব।'

'অবিশ্যি কোন প্রজাপতি জোগাড় করতে পারিনি—একটা মথও না।'

'তোমার নাম ?'

'লয়ঙ্কা—'

'বাঃ। আমরা দু'জন একই নামের।'

'সত্যি ? আপনি কি করেন ?'

'কিছুই না—'

'বলুন না···প্রত্যেকেরই ত একটা পরিচয় আছে···খুব জানার ইচ্ছে···

খুব ভাল লাগছে আপনাকে।'

'হতে পারে—'

'আমি বুঝতে পারি।···আপনি একটা দাগী'

'দাগী ?'

'হ্যাঁ, তাই।'

হাসল সে, চোখ পিট্‌পিট করল। যা আমার কাছে অর্থবহ।

'কি করে ভাবলে আমি দাগী ?'

'এতক্ষণ আমার পাশে বসে রইলেন, মানে রাতে বেরোতে আপনি ভয় পান।'

'কিন্তু ভোর হয়ে গেল যে।'

'তার মানেই, আপনি এখন বেরিয়ে পড়বেন—'

'আমি আবার আসব তোমার কাছে—'

কথাটা তার বিশ্বাস হল না। চোখ বন্ধ করে খানিক চুপ থেকে বলে উঠল, 'কেন, কিজন্য আসবেন ?'

'গল্প করতে।···খুব সুন্দর ছেলে তুমি···এলে তোমার আপত্তি আছে ?'

'আসবেন···অনেকেই ত আমাদের ঘরে আসে।' ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'অবিশ্যি এটা আপনার কথার কথা।'

'বিশ্বাস কর, আমি ঠিক আসব।'

'বেশ। আমার কাছে আসবেন তালে। কিন্তু মার ধারে যেতে পারবেন না '

'কে চায় ওকে ?'

'আপনি আমি দুজন বন্ধু।'

'বেশ।'

'আপনি বড় বলে খুব অসুবিধে নেই। বয়স কত ?'

'একুশে পা দিলাম—'

'আমি বারোতে পড়ব। আমার কোন বন্ধু নেই, কেবল ঐ ভাঁড়ির মেয়ে কাটকা। আমার কাছে আসে বলে ওর মা ওকে খুব পিটোয়।··· আচ্ছা, আপনি কি চোর ?'

'না। চোর হব কেন ?'

'অমন কুশ্রী মুখ আর লম্বা নাক ত চোরদের থাকে।···আমাদের বাড়িতে দুটো চোর আসে। একটার নাম শাসকা, মাথামোটা, ষণ্ডা···আর একটা ভানিসকা—ওর ভিতর কিছু দয়ামায়া আছে, ঠিক কুত্তার মত। আপনার কাছে খালি বাক্স আছে ?'

'নিয়ে আসব।'

'বেশ। আপনার আসার কথা মাকে বলব না—'

'কেন ?'

'এমনি।···লোক এলেই তো মার ফূর্তি। ও লোক ভালবাসে। মামণি আমার এক অদ্ভুত জীব। পনের বছরে ওর পেটে এসেছিলাম। আচ্ছা আপনি কবে আসছেন ?'

'কাল বিকেলে—'

'বিকেলে তো মা মাতাল হয়ে থাকবে ? আচ্ছা, চোর না হলে আপনি খেয়ে-পরে আছেন কি করে ?'

'আমি মধু বেচি।'

'তাই নাকি ? আমার জন্য একটা বোতল আনবেন ?'

'না আনার কি আছে ? আজ তবে চলি ?'

'যান। কাল তবে আসছেন ?'

'নিশ্চয়ই।'

সে তার লম্বা হাত দুখানা বাড়িয়ে দিতেই আমি পাতলা ঠাণ্ডা হাড় কগাছা নিজের হাতের মুঠোয় মৃদু চাপ দিলাম। আর পিছনে না ফিরে, মাতালের মত উঠোনে বেরিয়ে এলাম।

ভোরের আলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। জরাজীর্ণ অট্টালিকার মাথার উপর, আকাশের কোণে তখনও মস্ত শুকতারাটা দপ্‌দপ্‌ করছে। কুঠুরির চৌকোণা জানালার গর্তগুলো নোংরা, মাতালের মত মাটির দেয়াল ফুঁড়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দরজার সামনেই খাটিয়ায় লালমুখো একটা মানুষ নিদ্রাচ্ছন্ন। মস্ত পাজোড়া ছড়ান, মাথাটা খোলা, শক্ত দাড়ির-গোছা আকাশমুখী। হাঁ-করা ঠোঁটজোড়ার ভিতর কয়েকটা সাদা দাঁত ; যেন চোখ-বোজা এক নিষ্ঠুর দৈত্য আকাশের দিকে মুখ করে আছে। একটা কুকুর—পিঠে ঘা—হয়ত কেউ গরম জল ঢেলে দিয়েছিল, আমার পায়ের কাছে শুঁকতে শুঁকতে এক সময় ক্ষুধায় চীৎকার করে উঠল। উষার এ স্নিগ্ধ বাতাসে, আর্ত-ডাক আমার হৃদয়কে করুণ করে তুলল।

গতরাতের কাদাজলের খানা-খন্দগুলো এখন শান্ত। সেখানে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে ভোরের এই স্বচ্ছ আকাশ। তার নীল ও বেগুনি রং কাদা-জলের রূপ পাল্টে এমন এক সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে যা নির্মল, নিষ্ঠুর, আত্মভোলা।

পরদিন আমার এলাকার ছেলেদের কিছু প্রজাপতি এবং কাঁচপোকা ধরে দিতে বললাম। ওষুধের দোকান থেকে কিছু বাক্স জোগাড় করে, একবোতল মধু, কিছু রসাল কেক, মিষ্টি নিয়ে লয়ঙ্কার সাথে দেখা করতে গেলাম। উপহার পেয়ে লয়ঙ্কা ভয়ানক বিস্ময় বোধ করল। চোখজোড়া বিস্ফারিত এবং দিনের আলোর চাইতেও তা উজ্জ্বল ও সুন্দর।

'একি !'—তার গলাটা ঘড়ঘড় করে উঠল। 'কি এনেছেন ? খুব বড়লোক

নাকি আপনি ? এত বড়লোকের এমন নোংরা পোষাক, তাই বা কেমন করে হবে ? বলছেন আবার চোরও না। ইস্, কি সুন্দর বাক্স ! হাত পরিষ্কার নেই বলে ধরতে ভয় করছে। ভিতরে কি আছে ? আরে ! কি সুন্দর কাঁচপোকার ডাক ! তামাটে, সবুজ সব রং এর। কি মজা ! দাঁড়িয়ে কেন, একটু ছুটোছুটি করে নাচুন না ?'

হঠাৎ আনন্দে সে চিৎকার দিয়ে উঠল, 'মামণি ? এসো না ছাই, অপদার্থ'। আমার হাত ধুইয়ে দাও। দেখ, লোকটি কত জিনিস এনেছে, ঐ যে তোমাকে যে কাল রাতে ঘরে পেঁাছে দিয়েছিল। ওর নামও লয়স্কা।'

'তোমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত'—পিছন থেকে ধীর, গম্ভীর উত্তর শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটিও দ্রুত মাথা নাড়ল, 'ধন্যবাদ ! ধন্যবাদ !'

চত্তরের ধূলিধূসর অস্পষ্ট দৃষ্টির মধ্যে উনোনের এককোণে মহিলাটির আলুথালু বেশ, ভাঙ্গাচোরা মুখ। একসারি উজ্জ্বল দাঁতের ফাঁকে মৃদু বিজলির মত হাসি দেখতে পেলাম, যা মন থেকে সহসা মুছে ফেলা যায় না।

'সুপ্রভাত !'

'সুপ্রভাত।' মহিলাটি প্রত্যুত্তর দেয়। গলার স্বর শান্ত, উৎফুল্ল এবং প্রাণোচ্ছল। এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে চোখটা বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকাল।

আমাদের কথা ভুলে লয়স্কা তখন রসাল কেক খেতে খেতে সাবধানে বাক্সগুলোতে হাত দিচ্ছিল। তার চোখের নীল আভা পড়ছে গালে। কুঠুরির ময়লা জানলা দিয়ে দেখা দিয়েছে সূর্যের মুখ, অনেকটা মান্ধাতার বুড়োর মতো ঝাপসা। ক্ষীণ আলো পড়েছে বালকটির লাল, কুঞ্চিত কেশদামে। জামার বোতামটা খোলা, উদ্বেলিত দুর্বল হৃৎপিন্ডের আওয়াজ আমি এখান থেকে যেন শুনতে পাচ্ছিলাম।

ওর মা উনুনের পাশ থেকে সরে এসে, ভেজা গামছায় ওর হাতটা মুছে দিতে এল।

'ধর ! ধর ! পালাল'—একটা বাক্স হাতে ছেলেটা তীব্র উত্তেজনায় শরীরটা এলোপাথারি ছুঁড়তে, কাঁথাটা খসে বেরিয়ে পড়ল চির-পঙ্গু অসার

পাজোড়া। কাঁথাটা ঠিক করে দিতে দিতে মায়ের মুখের হাসিও বাধা মানল না।

'ধরুন! ধরুন!' বলেই নিজে কাচপোকাটা ধরে হাতের তালুতে নিয়ে গভীর মনোযোগে বিচিত্র রংগুলো দেখে, অতি পরিচিতের মত বলল, 'এগুলো আমাদের অনেক আছে—'

'টিপো না···টিপো না', ছেলেটি হাঁই হাঁই করে উঠল। 'জানো, মাতাল অবস্থায় একদিন সবকটা পোকা আমার টিপে মেরে ফেলেছিল।'

'ছিঃ, বলে না সোনা'—মহিলাটি একটু লজ্জা পায় 'মাতাল' কথাটা শুনে। 'মরা পোকাগুলো সব আমি পুঁতে ফেলেছি—'

মা এবার প্রতিবাদ করে বলল, 'কিন্তু তোমায় আমি অনেক জোগাড় করে দিইনি পরে?'

'কোন কাজে লাগেনি। তুমি যেগুলো নষ্ট করেছিলে, সেগুলো পুরনো, কথা শুনত, চালাকি করত না। তাই মরে গেলে, আমি হেঁচড়ে হেঁচড়ে গিয়ে উনুনের মধ্যে গুঁজে দিয়েছি। ওখানে আমার একটা কবর বানানো আছে। জানেন, মিনকা নামে একটা মাকড়সা ছিল, ঠিক মায়ের এক নাগরের মত—সেইযে মা, ফূর্তিবাজ বুড়োটা এখন জেলের ঘানি টানছে···।'

ময়লা হাতে ছেলেটির মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে মা মৃদু হেসে বলল, 'আমার দুষ্টু খোকন!' মৃদু কনুয়ের ঠেলা দিয়ে আমায় বলল,—'সত্যিই আমার প্রাণের ধন। এমন সুন্দর চোখ।'

ছেলেটি তখন ঝুঁকে একটা পোকার প্রতি গভীর মনোযোগ দিয়ে বলল, 'বেশতো একটা চোখ নিয়ে পাজোড়া ফিরিয়ে দাও।' আপন মনে পোকাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, 'ইস্ শরীরটা লোহার মত। কি রকম মোটা।···ঠিক সেই সাধুটার মত, মনে আছে মা, যাকে তুমি দড়ির মই বানিয়ে দিয়েছিলে?'

'খু-ব মনে আছে'—আমি তাকাতেই হেসে বলল, 'একদিন হঠাৎ এক সাধু এসে হাজির···জবুথবু মস্ত চেহারা। আমাকে দেখেই বলল, 'তুইতো

ফে'সো-দাড়ি কুড়োস, আমাকে একটা দড়ির মই বানিয়ে দিবি ?' 'জীবনে আমি ও মই দেখিনি, জানি না', বলতেই আলখাল্লা খুলে, পেট-জড়ান শক্ত একগাছা দড়ি বার করে শিখিয়ে দিল কায়দা-কানুন। অগত্যা বুনে দিতে হল, কিন্তু কি কাজে লাগে ও বস্তু ?···হয়ত গীর্জা থেকে চুরিটুরি করবে।" মৃদু হেসে পুনরায় সন্তানের গলা জড়িয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'সবজান্তা সোনা আমার। শেষে হল কি জানেন, লোকটা ঠিক চিনে হাজির। আমি বল্লাম, যদি চুরির মতলবে এটা বানিয়ে থাকেন, আমি দেব না। কথাটা শুনে সে একচোট ধূর্তের হাসি হাসল।'

'না, না, এটা দেয়ালে ওঠবার জন্য।···আমরা যেখানে থাকি সেখানে মস্ত এক দেয়াল। আমরা পাপী, পাপগুলো থাকে দেয়ালের ওপাশে। ভেবো না কিছু, দিয়ে দাও।' রাজি হতেই, লোকটা রাত কাটাতে চাইল। খুব হাসাহাসি হয়েছিল দুজনার।'

'তুমি ত কেবল হাসাহাসি ভালবাস, খোঁজও তাই'—ভারিক্কি গলায় ছেলেটি বলল। 'সামোভারে কি চাপাবে ?'

'চাপাব কি ? একদানা চিনি নেই ঘরে—'

'কিনে আন।'

'পয়সা ?'

'মদ খেয়েই গোল্লায় গেলে। ও'র কাছ থেকে নাও।'—আমার দিকে ফিরে বলল, 'আপনার কাছে পয়সা-কড়ি কিছু আছে ?'

আমি মার হাতে টাকা দিলাম। সে একলাফে নোংরা, তোবড়ান সামোভারটা উনুন থেকে নামিয়ে রেখে খুশিতে গুন গুন করতে করতে বেরিয়ে গেল। ছেলেটি পিছু ডাক দিল, 'মা, এই জানলাগুলো একটু পরিষ্কার করো, আমি কিছু দেখতে পাই না।'

স্যাঁতসেতে দেয়ালের গায়ে গজাল পুতে পাতলা কাঠের তাক বানান হয়েছে। পোকাগুলো সরিয়ে, সাবধানে বাক্স সাজাতে সাজাতে মায়ের সামনেই বলল, 'মুরগীর মত চতুর···যা বল্লাম আপনাকে। তবে ওর জীবনটাও

খুব কষ্টের। যেখানে কেঁসো-দড়ি কুড়োয়, আপনার দম বন্ধ হয়ে যাবে।
…ধুলোয় ভরা। মাঝে মাঝে আমি চেঁচাই : মা আমায় বাইরে নিয়ে চল, ভগবানের দোহাই, আমার দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মা বলে, ধৈর্য ধর বাছা, তুই ছাড়া আমার কে আছে? সত্যিই সে আমাকে খুব ভালবাসে। সারাদিন ঘরে শুধু তার কাজ হল আপন মনে গান।…প্রায় হাজারটা গান জানে।'

মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, চোখজোড়া জ্বলতে লাগল, সরু ভুরু-জোড়া বাঁকিয়ে উচ্চগলায় নিজেই গাইতে লাগল—'নরম গদির পরে শুয়ে থাকে সোমিয়া।'

শুনে বললাম, 'গানটা ভাল না।'

লয়ঙ্কাও সায় দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এগুলো এরকমই।'—হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'ঐ যে, গান বাজছে! জলদি করে একটু জানলার কাছে নিয়ে চলুন না!'

আমি তার অস্থিচর্মসার হালকা দেহটা তুলে ধরতেই, উৎসাহে জানলা দিয়ে মুখটা গলিয়ে দেয়াল আঁকড়ে রইল, নীচে পঙ্গু পাজোড়া শুকনো ভাঙ্গা ডালের মত ঝুলে আছে। বাইরে পথ দিয়ে, হারমোনিয়াম বাজিয়ে একটি বালক মিঠে গলায় গেয়ে চলছিল। নাছোড়বান্দা একটা কুকুর চেঁচাচ্ছিল অনর্গল। তালে তাল মিলিয়ে লয়ঙ্কা এই অন্ধ কুঠুরির মধ্যে মৃদু গলায় গুন গুন করছিল।

ইতিমধ্যে চত্বরের ধূলি-জাল সরিয়ে রোদ আরও উজ্জ্বল হচ্ছে। মায়ের বিছানার ঠিক ওপাশে, ধূসর দেয়ালে একটা সস্তা ঘড়ির ধাতব পেন্ডুলামটা ঘষা-পয়সার মত দুলেই যাচ্ছিল। উনোনের বাসনপত্তর ধোয়া নয়,—পুরু ধুলোর আস্তরণ। ঘরের কোণে কোণে জেগে আছে মাকড়সার বাসা আর ঝুল। লয়ঙ্কার বাসস্থান হল ঠিক ধূলিমলিন একটা গুহা। এ গুহার প্রতিটি বর্গইঞ্চি যেন নোংরা, অসহনীয়, বীভৎস এক দৃষ্টি মেলে বেহায়ার মত সবার দিকে তাকায়।

সামোভারে জল ফোটার শব্দ জাগছে, রাস্তায় হারমোনিয়াম থেমে যেতেই

কতকগুলো কর্কশ কণ্ঠ গর্জে উঠল, 'দূরে হ' আপদ।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে লয়ঙ্কা বলল, 'নামিয়ে দিন···লোকগুলো ওকে তাড়িয়ে দিল।' আমি আবার ওকে প্যাকিং-বাক্সের ওপর বসিয়ে দিলাম। কাশির সঙ্গে বুক ডলতে ডলতে মুখটা ব্যথায় কুঁকড়ে যাচ্ছিল।

'বুকটা ব্যথা করে। বেশিক্ষণ বাইরের আলো-বাতাস আমার সহ্য হয় না। বলছিলাম, আপনি কি প্রেতাত্মা দেখেছেন কখন।'

'না—'

'আমিও না।···আমি গভীর রাতে উনুনের নীচে তাকাই, কখনো বেরিয়ে আসে কি না। কিছু দেখি না। ওরা কবরস্থানে ঘোরে, তাই না?'

'তাদের দিয়ে কি দরকার?'

'খুব মজা। আচ্ছা দুএকটা প্রেতাত্মা যদি দয়ালু হয়? ভাঁড়ির মেয়ে কাটকা একদিন কুঠুরির মধ্যে প্রেতাত্মা দেখেছিল···তার তো দমবন্ধ হবার জোগাড়···কিন্তু আমি কোন জিনিসেই ভয় পাই না।'

পাজোড়া কাঁথার মধ্যে ঢুকিয়ে, সে এক নাগারে বলেই চলল, 'আমি ভয়ঙ্কর জিনিস পছন্দ করি···ভয়ঙ্কর স্বপ্ন আমার প্রিয়···আমি দেখিও। একবার স্বপ্ন দেখেছিলাম একটা গাছ উল্টে গিয়ে শিকড়গুলো বড় হতে হতে আকাশে ছড়িয়ে গেল, আর পাতাগুলো সব মাটির মধ্যে। সমস্ত শরীর ঘেমে গেছল, ঘুম ভেঙ্গে যেতেই কেমন শক্ত হয়ে গেছলাম।···একবার স্বপ্নে দেখেছিলাম মা'কে। উলঙ্গ হয়ে পড়ে আছে—একটা কুকুর তার পাকস্থলীটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। এক একটা টুকরো খুবলে নিচ্ছে আর ফেলে দিচ্ছে থু থু করে।···খুবলাচ্ছে আর ফেলছে···। একবার দেখেছিলাম আমাদের বাড়িটা কিছুক্ষণ কেঁপেই রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে চলেছে। দরজা-জানলাগুলো বেজে উঠছে দুরুম্-দারুম্। অফিসার-গিন্নীর বিড়ালটা ছুটছে এর পেছন পেছন।'

সরু ঘাড়টা অদ্ভুতভাবে ঝাঁকানি দিয়ে, হাতে মিষ্টি তুলে নিল। রঙ্গিন একটা কাগজের ভাঁজ খুলে সামনে টানটান করে রাখল জানলার উপর।

'কাগজ থেকে আমি অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস বানাব। অথবা কাটকাকেও দিয়ে দিতে পারি।...ও সুন্দর জিনিস ভালবাসে। ভাঙ্গাকাচ, কাগজ, থাপটাপ, অনেক জিনিস। আমি তো বলি, তুই যদি একটা গুবরে-পোকাকে রীতিমত খাইয়ে যেতে পারিস, একদিন ওটা ঘোড়া হয়ে উঠবেই, তাই না?'

বুঝলাম, নিজেও সে এ ধারণা পোষণ করে, সুতরাং জবাব দিলাম, 'ভালভাবে খাওয়াতে পারলে, হবে না কেন?'

'যাঃ, সত্যি?'—অধীর আত্মহারা হয়ে বলল, 'কিন্তু মা আমার একথা-গুলোতে কেবল রাগে কেন?'

সে একটা কটু মন্তব্য করল।

'মা একটা আস্ত গাড়োল! একটা বিড়ালকে ভালভাবে খাইয়ে জলদি ঘোড়া করা যায়, তাই না?'

'ঠিক—'

'আমার কপালটাই খারাপ, পেটপুরে খাওয়া জোটে না! পেলে কি মজা হত!'

ভয়ানক উত্তেজনায়, বুকটা চেপে ধরল।

'মাছি কুকুরের মত আকার নিয়ে ঘুরছে। গুবরে পোকারা ঘোড়ার মত শক্ত-সবল হলে ত ইটের বোঝা টানান যেতে পারে, তাই না?'

'মুশকিল হল ওদের যে শুঁড় আছে—'

'অসুবিধে নেই, শুঁড়ে আপনি লাগাম পরিয়ে দিতে পারেন।...আচ্ছা, একটা মাকড়সাই ধরুন না কেন—বিশাল...কার মত হবে? যদিও বিড়াল-ছানার চাইতে বেশি বড় আমি মনে করতে পারি না, যতই ভয়ের ব্যাপার হোক মাকড়সা জীবটি। শুধু যদি আমার হাঁটার ক্ষমতা থাকত, ওদের দেখিয়ে দিতাম কি দিয়ে কি করতে হয়।'

'দিনরাত পরিশ্রম করে এই সংগ্রহশালাটার পেট ভরাতাম; দোকান দিয়ে পয়সা কামিয়ে মার জন্য খোলামেলা আলোবাতাসে একটা বাড়ি বানিয়ে

দিতাম···আপনি কোনদিন খোলা মাঠে থাকার সুযোগ পেয়েছেন ?'

'সুযোগ পাবনা কেন—'

'কেমন অনুভূতি হয় বলুন তো ?'

আমি তাকে খোলা মাঠ এবং প্রান্তরের গল্প শোনালে, সে নীরবে মনোযোগ দিয়ে শুনে গেল। ভারী হয়ে এল চোখের পাতা, মুখগহ্বর ঈষৎ বিস্ফারিত—যেন গল্পের আবেশে ঘুমিয়ে পড়তে চায়। এই অবস্থায় আমি আস্তে আস্তে কথা বললেও ফুটন্ত সামোভারটা নিয়ে মা হাজির। হাতে ঠোঙ্গা, জামার পকেট থেকে উঁকি দিচ্ছে ভদকার বোতল।

'আসুন—'

বিস্ফারিত চোখে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছেলেটি বলল, 'আপনি সবকিছু সরিয়ে দিতে পারেন ? কেবল থাকবে ফুল আর সবুজ ঘাস। মা, তুমি কি একটা ঠ্যালায় করেও খোলা মাঠের মধ্যে নিয়ে যেতে পার না আমায় ? হায়, ওগুলো না দেখেই হয়ত আমার বিদায় নিতে হবে। তুমি এমনই নিষ্ঠুর, পশু।' গলার স্বর তার বিষণ্ণ হয়ে উঠল। মা মৃদু গলায় বলল, 'ছিঃ নোংরা কথা বলে না, তুমি এখন ছোট না ?'

'হ্যাঁ, তোমার মুখেই তো নোংরা কথা না বলার উপদেশ মানায়! কুকুরের মত তুমি যেখানে খুশি যাচ্ছ। যাক্, ভাগ্যটা তোমার নেহাৎ ভাল,' হঠাৎ আমাকে বলল, 'এই মাঠ, প্রান্তর কি ভগবানের সৃষ্টি ?'

'মনে হয়—'

'কি তার উদ্দেশ্য ?'

'মানুষের পায়ে হাঁটার জন্য।'

ছেলেটি হেসে বলল, 'উন্মুক্ত প্রান্তর, আঃ ! আমি সেখানে সংগ্রহশালাটা নিয়ে প্রত্যেকের মুক্তি দিতাম। তারা সুখে থাকত ! এই বন্দীজীবন থেকে বেরিয়ে আপন মনে ঘুরে বেড়াত। এরাই ত ভগবান সৃষ্টি করেছে, তাই না ?'

কথাটা শুনে স্ত্রীলোকটি চীৎকার দিয়েই হাসিতে সারা শরীর কাঁপিয়ে তুলল। ধপাস করে বিছানায় গড়িয়ে ছুঁড়তে লাগল হাত-পা।

'কে আছ আমায় তুলে ধর। আমার সোনামণি।'

লয়ঙ্কা একবার তাকিয়ে হেসে একটা অশ্লীল মন্তব্য করল।

'একেবারে ছেলেমানুষ। পেটে খিল ধরল বলে! দিনরাত হাসতে ভালবাসে।' অশ্লীল মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করতেই বললাম, 'হাসতে দাও। বিরক্ত হচ্ছ কেন?'

'বিরক্ত হইনি। আমার রাগ হয় যখন নোংরা জানলাটা পরিষ্কার করে না। পায়ে ধরি, বলি, মা ওটা পরিষ্কার কর, এমন রোদ, আলো আমার কপালে জোটে না, তবুও সে ভুলে যায়।'

কাপ-ডিসগুলো ধুতে ধুতে মুচকি হেসে স্ত্রীলোকটি আমার দিকে নীল-চোখের দৃষ্টি দিল। 'একটি রত্ন না? দিনরাত ওকে আশীর্বাদ করি···ও যদি না থাকত, কবে যে আমি গলায় দড়ি দিয়ে বা ডুবে মরতাম!'

লয়ঙ্কা বলে উঠল, 'আপনি কি গবেট?'

'মনে তো হয় না। কেন?'

'মা বলে আপনি একটি গবেট।'

'বুঝলাম। কিন্তু কি কারণ?'

স্ত্রীলোকটি নিষেধ করেও ছেলের জবাব বন্ধ করতে পারল না।

'রাতে আপনি রাস্তা থেকে একটা মাতাল মেয়েছেলেকে ঘরে আনার সুযোগ পেয়ে, বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চলে গেলেন, ব্যাস! আমি অবিশ্যি এতে রাগ করছি না। ভাবছি, কেমন বুদ্ধি করে মার গোপন ব্যাপারটা আমাকে ফাঁস করে দিলেন।' মহিলাটির কথা বলার ভঙ্গিও বালিকার মত। চোখ-জোড়াও নিষ্পাপ, কেবল কুৎসিত হল ক্ষয়ে-যাওয়া নাক, ক্ষতযুক্ত ঠোঁটের জন্য বেরিয়ে-আসা দাঁতের পাটি। আর কিছুটা খারাপ হাঁটা-চলার ভঙ্গি, ভাঁড়ামি, আর অমার্জিত কিছু কথাবার্তা।

উৎসাহে বলল, 'আসুন একটু চা খাওয়া যাক।'

লয়ঙ্কার পাশের বাক্সটার পর সামোভার। ঢাকনা ঠেলে বন্দী বাষ্প বেরিয়ে আসবার চেষ্টা চালাচ্ছে। সামোভারের মুখে হাত দিতেই তালু গরম ভাপে ভিজতেই মাথায় পুঁছে ফেলে ছেলেটি। যেন একটা খেলা। চোখে মুখে তার স্বপ্নালু দৃষ্টি।

'আমি বড় হলেই, মায়ের তৈরী ঠেলাগাড়িতে চড়ে পথে পথে হামাগুড়ি

দিয়ে ভিক্ষে চাইব। অনেক পয়সা জমলে হামাগুড়ি চালাব খোলা মাঠে।'

হাসির সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস বেরোতেই মা বলে, 'হায় কপাল! ও ভাবে খোলামাঠ বুঝি স্বর্গ। ওখানে সব ছাউনি পাতা, আছে কেবল বেহায়া ফৌজ আর মাতালগুলো।' লয়ঙ্কা প্রতিবাদ জানায়, 'মোটেই না। জিজ্ঞেস কর ওঁকে, কি রকম দেখতে—উনি নিজের চক্ষে দেখেছেন।'

'আমিও দেখেছি—'

'নিশ্চয়ই মাতাল হয়েছিলে।'

শিশুর মত দুজনে তর্ক জুড়ে দেয়। উত্তেজক, এলোপাথাড়ি। ইতিমধ্যে গ্রীষ্মের বিকেল গড়িয়ে যায়। রক্তবর্ণ সূর্যের পাশে জমতে থাকে ধূসর নীলাভ মেঘ। উঠোনে অন্ধকার হামাগুড়ি দেয়।

ছেলেটি পুরো একমগ চা খেয়ে একটু ঘামতে শুরু করল।

'পেট ভরে গেছে, ঘুমও আসছে দু চোখ ভেঙ্গে—'

মা বলল, 'ঘুমিয়ে পড় তা'লে—'

'উনি তো এই ফাঁকে চলে যাবেন···তুমিও কি বেরোচ্ছ?'

'ভাবছ কেন, ওঁকে যেতে দিচ্ছি না'—বলেই মহিলাটি আমায় হাঁটু দিয়ে গুঁতো দিল।

'যাবেন না কিন্তু'—বলেই লয়ঙ্কা চোখ বুজে, শরীরটা ছড়িয়ে, টুপ্ করে প্যাকিং-বাক্সের মধ্যে ঢুকে পড়ল। হঠাৎ মাথাটা তুলে মাকে ভর্ৎসনা করে উঠল, 'যারা তোমাকে শুধু পিটোয়—সেই রাম-শ্যাম-যদু-মধুর সঙ্গে চলাচলি না করে অন্য দশটা মেয়েমানুষের মত ওঁকে বিয়ে করে ঘর করতে পার না? ···উনি মানুষটা খুবই দয়ালু···।'

'ঘুমিয়ে পড়'—শান্ত গলায় কথাটা বলেই, নীরবে চোখজোড়া নীচু করে চায়ের কাপে মনোযোগ দিল।

'তাছাড়া ওনার পয়সাকড়িও আছে।'

কিছুটা সময়ের জন্য মহিলাটি নির্বাক বীভৎস ঠোঁটজোড়া দিয়ে কেবলই কাপে চুমুক দিয়ে চলেছে। হঠাৎ খুব পরিচিতের মত বলে উঠল, 'এই আমাদের জীবনের ধারা···ক্লান্ত, একঘেঁয়ে। ও আর আমি, আমি আর ও, আর কেউ নেই। পথে আমাকে সবাই ভর্ৎসনা করে, ডাকে খানকি। কি

আসে যায় ? আমার তো কিছুতেই লজ্জা পাওয়ার নেই। সত্যিই তো, পৃথিবীর চোখে আমি তো জঞ্জাল, আপনি নিজের চোখে দেখলেন। যে কেউ চোখ খুললেই বুঝতে পারবে। হ্যাঁ, সোনামণি আমার ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার এ ছেলেটি বড় ভাল।'

'সত্যিই ভাল—'

'আমি ওর দিকে নজর দেয়ার সুযোগ পাই না। খুব বুদ্ধি রাখে তাই না ?'

'খুবই বুদ্ধিমান—'

'আপনিই প্রথম বললেন। ওর বাবাও ছিল ভদ্র···বয়স্ক। কাজ করত একটা অফিসে কি যেন নাম, আহাঃ ভুলে যাচ্ছি, কি বলেন আপনারা ? যেখানে কাগজপত্র লেখা হয় ?'

'দলিল ঘর ?'

'হ্যাঁ, খুবই ভদ্র, দয়ালু ছিলেন। আমাকে বড় ভালবাসতেন। আমি তাঁর বাড়ি ঝি-এর কাজ করতাম।'

উঠে গিয়ে, খোলা পাদুটো কাঁথায় ঢেকে দিল। টুকিটাকি দিয়ে বালিশ বানিয়ে মাথাটা কাৎ করিয়ে, পুনরায় শুরু করল।

'হঠাৎ একদিন উনি মারা গেলেন ! ব্যাপারটা হয়েছিল রাতে, আমি তখন কাজ সেরে চলে এসেছি। ধাম্ করে মেঝেয় পড়ে গেলেন, পর মুহূর্তেই মৃত্যু। আপনি তো ব্যবসা করেন, মধু বেচেন ?'

'হ্যাঁ—'

'নিজের—?'

'না, মালিক আছে।'

সে আরও ঘন হয়ে এল।

'আমার ব্যাপারে খুঁতখুঁত করার প্রয়োজন নেই, মশাই। আমার মধ্যে সংক্রামক কিছু নেই, আপনি রাস্তার লোকদের জিজ্ঞেস করতে পারেন।

'আমি খুঁতখুঁতে নই।'

সে তার ক্ষয়ে-যাওয়া নখ, কর্কশ আঙুলের ছোট্ট হাতখানা আমার হাঁটুর ওপর আলতো রেখে মনের উত্তাপে বলতে লাগল, 'দরকার জন্য আমি

আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।...আজকের তারিখটা ওর কাছে এক স্মরণীয় উপভোগ্য দিন। আপনি আজ দারুণ উপকার করেছেন আমার।'

'আমি উঠব'—বলতেই সে বিস্ময়ে বলল, 'কোথায় ?'

'কাজ আছে—'

'থেকে যান—'

'উপায় নেই',সে একবার পুত্রের দিকে,আবার ক্রমাগত জানালা, আকাশের দিকে তাকিয়ে শান্তস্বরে বলল, 'থাকতে চাইছেন না কেন ?...আমি যদি আমার এ মুখ রুমাল দিয়ে ঢেকে রাখি ? পুত্রের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছে করছে। যদি বলেন তো আমি আমার শরীরটাও ঢেকে রাখব ?' হৃদয়ে এক গভীর উত্তাপ ও অনুভূতির সুরে সে কথাগুলো বলল। ভাঙ্গাচোরা মুখে, শিশুর সারল্যে-ভরা চোখজোড়া ঝলমল করে উঠল। সে হাসিতে কোন দৈন্য নেই, বরং আছে এমন আত্মিক-সমৃদ্ধির ছাপ যা নাকি কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধে সক্ষম।

'মা !'—ঘুমের মধ্যে জেগে উঠে ছেলেটি চীৎকার দিল, 'হামাগুঁড়ি দিচ্ছে ! তাড়াতাড়ি মা।' ছেলের দিকে ঝুঁকে বলল, 'স্বপ্ন দেখছ।'

আমি উঠোনে নেমে এসে খানিক আচ্ছন্ন হয়ে রইলাম। কুটুরির খোলা জানালা থেকে উচ্চস্বরে গান ভেসে আসছে। ঘুমপাড়ানি গান। অদ্ভুত কলির স্বপ্নালু সুরের গান কানে ভেসে এল।

'ফিরে এল জীবনের জীর্ণতা
পিছু পিছু দুঃখ ও দৈন্য
সংখ্যায় তারা নয় মোটেই নগণ্য
কেঁদে কেঁদে কলজেটা হয়ে গেল শূন্য
আমি যে অভাগী
আমি যে অভাগী
কোথা ছুটে গেলে পাব এক ফোঁটা শান্তি।'

আমি দাঁতে দাঁত ঘসতে ঘসতে দ্রুত উঠোন পেরিয়ে গেলাম।

# মানুষের জন্ম

সেটা ছিল '৯২ সালের দুর্ভিক্ষের বছর। কোডর নদীর তীরে, সমুদ্র থেকে সামান্য দূরে, সুখুমে ও ওকেম্চিরীর মধ্যবর্তী একটি স্থান। চকচকে পাহাড়ী স্রোতের কলতান ছাপিয়ে সমুদ্রের ঢেউগুলো তীরে আছড়ে পড়ছে ও তার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

শরৎকাল। চেরীগাছের হলুদ পাতাগুলো কোডর নদীর সাদা ফেনার মধ্যে তৎপর রুই মাছের মত পাক খাচ্ছে, ছুটে বেড়াচ্ছে। আমি নদীর ধারে, পাথরগুলোর ওপরে বসে আছি, আর চিন্তা করছি, গাল ও করমোরেট পাখীরাও সম্ভবতঃ পাতাগুলোকে মাছ বলে ভুল করছে এবং হতাশ হয়ে উঠছে। আর সেই কারণেই তারা আমার ডানদিকে, গাছগুলো থেকে কিছু দূরে যেখানে সমুদ্র এসে তীরে আছড়ে পড়ছে, এমন আহত স্বরে চিৎকার করে উড়ে বেড়াচ্ছে।

মাথার উপরে চেস্টনাট গাছগুলো সোনার মত চকচক করছে। আর পায়ের কাছে অসংখ্য পাতা পড়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন মানুষের বিচ্ছিন্ন-হাতের-পাতা ছড়িয়ে আছে। নদীর অপর পারে হর্নবিম গাছের শাখাগুলোর পাতা ইতিমধ্যেই খসে পড়ে গেছে—শাখাগুলো ছেঁড়া জালের মত ঝুলে রয়েছে। তার মধ্যে একটি লাল-হলুদ পাহাড়ী কাঠঠোকরা লাফিয়ে লাফিয়ে এক ডাল থেকে আর এক ডালে তার কালো ঠোঁট দিয়ে পোকার খোঁজে গাছের ছাল ঠোকরাচ্ছে। সুদূর উত্তর থেকে আগত অতিথিরা —ছটফটে ছোট্ট টমটিট্‌স ও ধূসর নুথাচেস পাখীরা সেসব পোকা আগেই খেয়ে গেছে।

আমার বাঁদিকে, পাহাড়ের চূড়া ঘেঁসে, কালো ধোঁয়ার মত মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে—হয়ত বা বৃষ্টি হবে। পাহাড়ের সবুজ ঢালু জমির উপরে সেই মেঘের ছায়া এসে পড়েছে। সেই ঢালু জমিতে শুকনো বক্সউড গাছ জন্মায়, আর সেখানে ফুরোণো বীচ ও বাতাবিলেবু গাছের কোটরে বন্য-মধু পাওয়া যায়। রোমের রাজত্বকালে সেই মধু মহান পম্পেই-এর সৈন্যবাহিনীর

র্বনাশ ঘটিয়েছিল প্রায়—একটা পুরো বাহিনী সেই মধুরে মাতাল-করা মিষ্টত্বে মাটিতে ঢলে পড়েছিল। লরেল ও এজালিয়া গাছের ফুল থেকে মৌমাছিরা এই মধু সংগ্রহ করে। আর পথিকেরা গাছের কোটর থেকে এই মধু সংগ্রহ ক'রে পাতলা ময়দার কেক, লাভাশ-এর উপর ছড়িয়ে খায়।

চেস্টনাট গাছের নীচে, পাথরের উপরে বসে, আমিও ঠিক তা-ই করছি ও একটা ক্রুদ্ধ মৌমাছির হুলের দংশনস্থানে হাত বোলাচ্ছি। একটা চায়ের পাত্রে-ভরা মধুর মধ্যে রুটি ডুবিয়ে খাচ্ছি, আর শরতের অবসন্ন সূর্যের মদির আলস্যভরা লীলা উপভোগ করছি।

শরৎকালের ককেসাস্ পর্বত দেখতে অনেকটা মহান জ্ঞানী-ব্যক্তিদের তৈরী বৈভবপূর্ণ ক্যাথিড্রালের ভেতরকার দৃশ্যের মত। সেই জ্ঞানী-ব্যক্তিরা আবার বড় বড় পাপীও বটে। বিবেকবুদ্ধির তীক্ষ্ন দৃষ্টি থেকে তাদের অতীতকে আড়াল করার জন্যই এই ক্যাথিড্রাল তৈরী করা হয়েছিল। নীলমণি ও পান্না-খচিত একটি বিশাল স্বর্ণমন্দির। পাহাড়ের দিকটা সিল্কের-তৈরী মসৃনতম কার্পেটে মোড়া—এই কার্পেট তুর্কীরা বানিয়েছে, বানান হয়েছে সমরখন্ড ও শেমাহাতে। তারা সারা বিশ্ব লুণ্ঠন করে সম্পদ এনে এখানে সূর্যের মুখোমুখি এই মন্দির বানিয়ে যেন বলতে চাইছে: "তোমার—তোমা থেকেই—তোমাকেই!"

আমি দেখতে পাচ্ছি লম্বা লম্বা দাঁড়িওয়ালা পক্ককেশী দৈত্যেরা, হাস্যোজ্জ্বল শিশুর মত বড় বড় চোখ নিয়ে পাহাড় দিয়ে নেমে আসছে। মুক্ত হস্তে তারা রং-বেরং-এর সম্পদ ছড়াতে ছড়াতে, সমতলভূমিকে সুসজ্জিত করছে। দেখতে পাচ্ছি তারা রূপার পুরু আস্তরণে পাহাড়ের চূড়াগুলোকে ঢেকে দিচ্ছে এবং সমস্ত অঞ্চলগুলো মেনিফোল্ড গাছের প্রাণবন্ত কাপড় দিয়ে ছেয়ে দিয়েছে। আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের হাতের ছোঁয়ায় স্বর্গীয় সুষমা ভরা এই জমিটা অবর্ণনীয় সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

কি চমৎকার একটি আমন্ত্রণ—এই পৃথিবীতে মানুষের আমন্ত্রণ! বিস্ময়কর বস্তুর কি অদ্ভুত সম্পদই দেখা যায়! সৌন্দর্যের নীরব আনন্দ কি তীব্র মিষ্টি হয়ে মানুষের হৃদয়ে আলোড়ন আনে!

সত্যি কথা বলতে কি, মাঝে মাঝে আপনারও দুর্বোধ্য লাগে। জ্বলন্ত

ঘৃণা আপনার বুকটা ভরে রাখে এবং ক্রোধ লোভাতুরভাবে আপনার হৃদয়ের রক্ত চুষে নেয়, কিন্তু তা চিরকাল ধরে ঘটতে পারেনা। এমনকি প্রায়শই সূর্যও অত্যন্ত করুণভাবে মানুষের প্রতি ঘৃণা বর্ষণ করে ; সে তাদের জন্য কত কষ্টই না করেছে, অথচ তারা কি জঘন্য হয়ে উঠেছে··· ।

স্বাভাবিকভাবেই, বেশ কয়েকজন ভাল মানুষও আছে, কিন্তু তাদের কিছু সংশোধন করতে হবে, অথবা বরং তাদেরকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে।

আমার বাঁদিকের ঝোপের উপর দিয়ে মানুষের কালো কালো মাথা দেখতে পাচ্ছি—মাথাগুলো ঝুঁকে ঝুঁকে চলছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের মৃদু গর্জন ও নদীর কলতানের মধ্যে মানুষের কণ্ঠস্বর মৃদুভাবে শোনা যায়। এ কণ্ঠস্বর "দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের"। এরা সুখুমে একটা রাস্তা বানাচ্ছিল, আর এখন চলেছে ওচেমচিরীর পথে—যদি সেখানে কোন কাজ পায়, এই আশায়।

আমি ওদের জানি—ওরা ওরেল থেকে আসছে। আমি ওদের সাথে কাজ করেছিলাম এবং পরশুদিন আমাদের সকলকে একসাথে ছাটাই করে দেওয়া হয়েছে। আমি ওদের আগেই যাত্রা করেছি—রাত্রিবেলা, যাতে সময়-মত সমুদ্রতীরে এসে সূর্যোদয় দেখতে পারি।

ওরা ছিল সংখ্যায় পাঁচজন—চারজন কৃষক ও একজন চোয়াল-বার-করা যুবতী কৃষক-রমণী, সে পোয়াতী ; তার বিরাট পেটটা উঁচু হয়ে ওপরের দিকে ওঠা। আর তার নীল-ধূসর চোখে ছিল ভয়ের দৃষ্টি। আমি দেখতে পাচ্ছি তার হলুদ-স্কার্ফে-ঢাকা মাথাটা সূর্যমুখী ফুলের মত বাতাসে ঝোপের উপরে দুলছে। সুখুমে ওর স্বামী মারা গেছে। আমি এদের সাথে একই ঝুপড়িতে বাস করতাম ; চিরাচরিত রুশী প্রথায় তারা তাদের দুর্ভাগ্যের কথা এত বেশী করে জোর দিয়ে বলত যে তাদের হা-হুতাশ তিন মাইল দূরে থেকেও শোনা যেত।

দুর্ভাগ্যের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে এই লোকগুলো এখন নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। দুর্ভাগ্য তাদের দেশের জীর্ণ, উপবাসী মাটি থেকে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু করে দিয়ে শরতের পাতার মত ঝেঁটিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে। এখানকার

এই অদ্ভুত, সম্মুখে ভূখন্ড তাদের হতবিহ্বল ও বিভ্রান্ত করে দিয়েছে। কঠোর পরিশ্রমের ফলে তাদের সমস্ত বোধশক্তি লুপ্ত। তারা তাদের চারিদিকের প্রতিটি বস্তুর দিকে করুণ, মিটমিটে, উদাস চোখে বিভ্রান্তভাবে চেয়ে দেখে এবং অসহায়ভাবে একে অপরের দিকে তাকিয়ে মিনমিন করে বলে :

'আরে আরে, কি সুন্দর জমি !'

'কথাটা যেন কি, সমৃদ্ধশালী, তাই না !'

'অবশ্য একটু পাথুরে।'

'না যা-তা জায়গা নয়, এ আমি অবশ্যই বলব।'

আর এর পরই তারা তাদের জন্মস্থান কোবিলি লোজোক, সুখোই গোন, মোক্রেনকোঙ্গ-র কথা স্মরণ করে। সেখানকার প্রতি-মুঠি ধুলো-মাটি তাদের পিতৃপুরুষের চিতাভস্ম, সেখানকার প্রতিটি জিনিস নিখুঁতভাবে তাদের মনে আছে। সেসব তাদের কত পরিচিত ও প্রিয়, তাদের ঘামে ভেজা।

দলের সাথে আরও একজন রমণী ছিল। একটি ঢ্যাঙ্গা, লিকলিকে চোয়াল-বাঁকা মেয়েছেলে। তক্তার মত সমতল তার বুক এবং চোখজোড়া ভাবলেশহীন, কয়লার মত কালো ও ট্যাঁরা।

সন্ধ্যেবেলা সে ও এই হলুদ-স্কার্ফ-মাথায় মেয়েটি সেই ঝুপড়ির পেছন দিকে চলে যেত। সেখানে একগাদা পাথরের উপরে বসে সেই ঢ্যাঙ্গা মেয়েছেলেটি হাতের থাবায় থুতনিটা রেখে, মাথাটা একদিকে কাত করে, উচ্চকণ্ঠে, রুদ্ধস্বরে গান গেয়ে উঠত :

গ্রামের চার্চটি ছাড়িয়ে
সবুজ ঝোপের মাঝারে
হলুদ বালির উপরে
মোর সাদা ঝকঝকে চাদরটা দেব বিছিয়ে।
সেখানে রইব বসে
মোর সুন্দর প্রিয় আশে,
যখন সে ফিরে আসে
তারে নেব দুই বাহু বাড়িয়ে···

হলুদ-রুমাল-বাঁধা মহিলাটি সাধারণতঃ চুপ করে বসে, মাথা নীচু করে তার তলপেটের দিকে তাকিয়ে থাকত। কিন্তু মাঝে মাঝে সেও হঠাৎ গানে

অংশ নিত। গভীর, অলস, পুরুষালী গলায় সে সেই গানের কান্নাভরা কথাগুলো গাইত :

হে প্রিয় আমার,

ওগো প্রিয় প্রাণ,

তোমার কি দেখা

পাবো নাকো আর···

দক্ষিণে রাত্রিবেলায় এই কালো দমবন্ধ করা অন্ধকারের মধ্যে এই কান্নাভরা কণ্ঠস্বরগুলো মনে করিয়ে দিত উত্তরের কোন এক তুষারাবৃত নির্জন বনভূমি, তুষার-ঝন্‌ঝার শব্দ ও দূরবর্তী নেকড়ের গর্জন···।

তারপর সেই ট্যারা মেয়েছেলেটি জ্বরে পড়ে এবং একটি কাপড়ের স্ট্রেচারে করে তাকে শহরে নিয়ে যাওয়া হয়। সে সেই স্ট্রেচারের উপরে কাঁপে আর গোঙায়—যেন মনে হয় সে তার সেই চার্চ ও হলুদ বালির গানটি তখনও গেয়ে চলেছে।

রুমাল-বাঁধা মাথাটি ডুব দিল—আর দেখা গেল না।

আমার সকালের খাওয়া শেষ। গাছের পাতা দিয়ে মধুর পাত্রটি ঢেকে দিলাম। বোঁচ্‌কাটা বেঁধে নিয়ে মানুষের চলা-পথ ধরে মন্থর গতিতে হাঁটতে লাগলাম। হাতের কর্নেল-গাছের লাঠিটা শক্ত মাটিতে ঠুকে ঠুকে যেতে লাগলাম।

রাস্তার সরু অংশটির উপরে আমি চলে এলাম। আমার ডানদিকে ঘন নীল সমুদ্র গর্জন করছে। মনে হচ্ছে যেন অদৃশ্য সব ছুতোরমিস্ত্রী হাজার হাজার রেঁদা নিয়ে সমুদ্রের উপরে ঘসছে, আর সাদা চাঁছলাগুলো বাতাসের তাড়া খেয়ে ছুটে তীরের দিকে আসছে। সেই বাতাস ভেজা, উষ্ণ ও সুগন্ধময়—যেন কোন স্বাস্থ্যবতী রমণীর নিঃশ্বাস। একটি তুর্কী জাহাজ বন্দরের দিকে মুখ করে জলের উপর দিয়ে সুখুমের দিকে যাচ্ছে। জাহাজের পালটা সুখুমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সেই নাদুস-নুদুস ইনজিনিয়ারের ফোলা-গালের মত ফুলে রয়েছে। কেন জানি না লোকটা সব সময়ই "সাট আপ"-এর পরিবর্তে "শাশ উপ", আর "মে বি"-র পরিবর্তে বলে "মইবী"।

'শাট আপ! মইবী, তুই নিজেকে স্মার্ট ভাবিস, কিন্তু এই মুহূর্তে তোকে টেনে হিচ্‌ড়ে থানায় নিয়ে যাব!'

সে লোককে থানায় নিয়ে যেতে খুব ভালবাসত, আর এখন ভাবতে ভাল লাগছে যে কবরের পোকারা ইতিমধ্যে তাকে চেটেপুটে খেয়ে নিছকই হাড়ে পরিণত করেছে।

আমি কত সাবলিলভাবে হেঁটে চলছি—যেন বাতাসে ভেসে যাচ্ছি। সুখকর চিন্তা, রং-বেরং-পোষাকে-সজ্জিত স্মৃতিরাজী আমার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে নেচে বেড়াচ্ছে। মনের মধ্যে নৃত্যরত শরীরগুলো যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মত—মাথা সাদা, কিন্তু অতল গভীরে তারা শান্ত। সেখানে যৌবনের উজ্জ্বল ও ভাসমান আশাগুলো লোনা জলে রূপালী মাছের মত নীরবে সাঁতার কেটে চলে।

রাস্তাটা সমুদ্রের তীরের দিকে এগিয়ে গেছে। ক্রমে ক্রমে তা বালুচরের কাছে, যেখানে ঢেউগুলো এসে আছড়ে পড়ছে, সেখানে গিয়ে মিশেছে। ঝোপের গাছগুলো ফিতের মত রাস্তার উপরে যেভাবে ঝুঁকে রয়েছে ও জলের নির্জনভূমির নীল অসীমের দিকে যেভাবে মুখ ফিরিয়ে আছে, মনে হচ্ছে তারাও সমুদ্রের দর্শন লাভে অত্যন্ত ব্যগ্র।

পাহাড় থেকে বাতাস বয়ে আসছে—বৃষ্টির ইঙ্গিত।

ঝোপের ভেতর থেকে চাপা গোঙানীর শব্দ আসছে—মানুষের গোঙানীর শব্দ, যা অন্য মানুষের হৃদয়ের অনুভূতির তন্ত্রীতে সর্বদাই সাড়া জাগায়।

আমি ঝোপটা ফাঁক করেই দেখি, সেই হলুদ-রুমাল-বাঁধা মহিলাটি একটি আখরোট গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে আছে। মাথাটা তার কাঁধের উপর ঝুলে রয়েছে, মুখ বিকৃত, চোখদুটো স্ফীত, ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে। হাতদুটো তার বিশাল পেটের উপর রাখা। আর এমন ভয়ংকর, অস্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে যে পেটটা ঝাঁকানি খেয়ে ফুলে ফুলে উঠছে। সে হাতদুটো দিয়ে পেটটা ধ'রে গোঙাচ্ছে, আর তার নেকড়ের মত হলুদ দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে।

'কি হল? মেরেছে কেউ?' তার দিকে ঝুঁকে আমি প্রশ্ন করলাম।

সে ধুসর ধুলোর উপরে তার নগ্ন পা এলোপাথারি আছড়াতে আছড়াতে, ভারী মাথা এদিক ওদিক ঘুরিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে উঠল :

'চলে যাও···তোমার লজ্জা নেই, চলে যাও···।'

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা কি—আগে একবার এরকম ব্যাপার দেখেছি। অবশ্যই ভয় পেয়ে আমি পেছনে ফিরে যেতে শুরু করলাম। কিন্তু মহিলাটি টানা টানা সুরে চিৎকার করতে শুরু করল, তার চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। চোখ জলে ভরা ও লাল উত্তেজিত গাল বেয়ে জলের ধারা নেমেছে।

এ সব দেখে আমি তার কাছে ফিরে এলাম। বোঁচকা, কেটলী ও চায়ের পাত্রটা ফেলে রাখলাম মাটিতে। তারপর তাকে চিৎকরে মাটিতে ফেলে হাঁটুজোড়া মুড়ে ওপরের দিকে তুলতে গেলাম। সে আমায় মুখে ও বুকে আঘাত ক'রে, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। তারপর ঘুরে, হামাগুঁড়ি দিয়ে ঝোপের আরও ভিতরে ঢুকে গেল। মেয়ে-ভালুকের মত দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল :

'শয়তান! জানোয়ার!'

তার হাত নেতিয়ে পড়ল এবং সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আবার সে চিৎকার শুরু করে দিল—পা আছড়াতে লাগল।

প্রচন্ড উত্তেজনায় আমি এ ব্যাপারে যা জানি সব দ্রুত স্মরণ করে নিলাম। তাকে ঘুরিয়ে চিৎ করে দিলাম এবং তার হাঁটুদুটো মুড়ে উপরের দিকে তুলে ধরলাম—জলভরা পাতলা পর্দাটা ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে।

'চুপ করে শুয়ে থাকুন, বেরচ্ছে।'

আমি ছুটে সমুদ্রের দিকে গেলাম। হাতা গুটিয়ে, হাতদুটো ধুয়ে ধাইয়ের কাজ করার জন্য ফিরে এলাম।

দাবানলে বার্চগাছের ছালের মত মহিলাটি আছাড়ি-বিছাড়ি খাচ্ছে। সে তার দুই থাবা দিয়ে আশেপাশের মাটি খামচে ধরছে এবং শুকনো ঘাস ছিঁড়ে মুখে পুরে দিতে চেষ্টা করছে। ফলে তার বিকৃত, ভয়ংকর, রক্তচক্ষু-মুখের উপরে কিছু মাটি ঝরে পড়ল। তারপর পাতলা পর্দাটা ছিঁড়ে গেল ও শিশুর মাথা দেখা দিল। আমি তার দু পায়ের দাপানি থামিয়ে

রাখলাম ও শিশুটিকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করলাম, আর লক্ষ্য রাখলাম যাতে সে যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট মুখে ঘাস ঢোকাতে না পারে।

আমরা একে অপরকে গালাগাল দিলাম—সে দিল দাঁত কড়মড় করে, আর আমি দিলাম নীরবে। সে দিল যন্ত্রণা ও সম্ভবতঃ লজ্জা থেকে, আর আমি দিলাম বিব্রতবোধ থেকে, অন্তহীন সমবেদনা থেকে।

'ভগবান!' সে নীল ফেনাভরা ঠোঁটটা কামড়ে ধরে প্রচন্ড হাঁফাতে লাগল। আর তার চোখ থেকে অঝোরে ঝরে পড়ছে একজন ভয়ঙ্করভাবে-বিধ্বস্ত-মায়ের চোখের জল। তার চোখ হঠাৎই যেন সূর্যের আলোতে ঘোলাটে হয়ে গেল। তার সমস্ত শরীর এমনভাবে মোচড় খাচ্ছে যেন তা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

'চলে যাও···শয়তান···!'

সে আমাকে তার ভাঁজ-করা হাত দিয়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল, আর আমি তাকে আন্তরিকতার সাথে বললাম:

'বোকামো করবেন না! তাড়াতাড়ি! ব্যাপারটা শেষ হোক!'

ওর জন্য আমার প্রচন্ড দুঃখ হচ্ছে। মনে হচ্ছে ওর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে। আমার খুব রাগ হচ্ছে, ভাবছি চিৎকার করে উঠব। সত্যি সত্যিই আমি চিৎকার করে উঠলাম:

'জলদি! তাড়াতাড়ি!'

আরে দেখ—আমার হাতে এসে পড়ল একটা পুরুষ শিশু—একটি লাল খুদে মানব। আমার চোখ জলে ঝাপসা হয়ে গেলেও দেখতে পেলাম শিশুটা লাল টুকটুকে। সে ইতিমধ্যেই এই পৃথিবী সম্পর্কে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে। ছটফট করছে, পা ছুঁড়ছে ও আকুলভাবে চিৎকার করছে। অবশ্য এখনও সে তার মায়ের নাড়িতে আবিষ্ট। শিশুটির চোখ লাল। তার লাল অবয়বহীন মুখে রয়েছে একটা অদ্ভুত' খুদে চ্যাপ্টা নাক। আর চিৎকার করার সময় তার ঠোঁটদুটো ফাঁক হয়ে যাচ্ছে:

'ওঁ য়া—য়া—য়া···ওঁ য়া—য়া—য়া···।'

ওর শরীরটা এত পিচ্ছিল যে আমার ভয় করছে, হাত থেকে না পিছলে যায়। আমি হাঁটুগেড়ে বসে, ওর দিকে তাকিয়ে হাসি—ওকে

'মিনিট খানেকের জন্য সরে যাও।'

'লজ্জা পাচ্ছেন কেন।'

'ঠিক আছে, তুমি যাও।'

আমি একটি ঝোপের ভেতর ঢুকে গেলাম। আমার হৃদয় দিশাহারা, মনে হচ্ছে উজ্জ্বল পাখীরা আমার বুকের মধ্যে গান গাইছে। এই অনুভূতির সঙ্গে সমুদ্রের মৃদু গর্জন এতই চমৎকার যে আমি বছরের পর বছর ধরে তা শুনেতে পারি।

কাছে কোথাও কোন ছোট নদীর কলতান শোনা যাচ্ছে। যেন কোন তরুণী তার বান্ধবীর কাছে প্রিয়জনের গল্প করছে।

ঝোপ ছাড়িয়ে হলুদ-রুমাল-বাঁধা একটি মাথা দেখা গেল—রুমালটা এখন ঠিকভাবে বাঁধা।

'এই যে, কি ব্যাপার? খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল—তাই না?'

ঝোপের কয়েকটা ডাল ধরে ফ্যাকাশে মুখে সে সেখানে বসে পড়ল—যেন তার জীবনীশক্তি শেষ হয়ে গেছে। চোখজোড়া তার দুটো নীল জলের সরোবর। হেসে, কোমল আবেগে সে ফিসফিস করে বলল:

'দেখ কেমন ঘুমিয়ে আছে।'

আমারও মনে হচ্ছে সত্যি কি সুন্দরভাবে ঘুমিয়ে আছে, আর দশটা শিশুর সাথে কোন পার্থক্য নেই। যদি কোন পার্থক্য থেকে থাকে তা হ'ল পরিবেশের। ঝোপের নীচে, শরতের উজ্জ্বল পাতার ঢিপির উপরে সে শুয়ে আছে। এ ধরনের গাছ ওরেলের গ্রামে জন্মায় না।

'আপনার শুয়ে পড়া উচিত, মা।'

'না', দুর্বলভাবে সে মাথা নেড়ে জবাব দিল। 'আমাকে পরিষ্কার হয়ে নিতে হবে এবং সেই জায়গাটায় যেতে হবে—কি যেন নাম?'

'ওকেমচিরী?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। আমার দলের লোকেরা এতক্ষণে বেশ কয়েক মাইল এগিয়ে গেছে।'

'আপনি নিশ্চয়ই হেঁটে যাবেন না?'

'পবিত্র ভার্জিন সহায়। তিনি আমায় সাহায্য করবেন।'

বেশ, পবিত্র ভার্জিন যখন তার সহায়, আর আমার বলার কিছুই নেই।

সে চোখ নামিয়ে কুঞ্চিত ছোট্ট মুখটির দিকে তাকাল। চোখজোড়া তার করুণার আলো ছড়াচ্ছে। সে তার ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে হাত দিয়ে ধীরে ধীরে তার বুকে চাপড় মারল।

আমি চারিদিকে পাথর বসিয়ে আগুন জ্বাললাম, যাতে কেটলি বসান যায়।

'মিনিট খানেকের মধ্যেই আপনার জন্য চা বানিয়ে দিচ্ছি, মা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কর! আমার বুকটা যেন শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছে।'

'দলের লোকেরা আপনাকে ফেলে গেল কেন?'

'না, না—তারা ফেলে যায় নি। আমি পেছনে থেকে গিয়েছিলাম। জানো তো, ওদের কাছে এক রকমের মদ আছে···আর সেটা যে কি ভাল। ইচ্ছে করছে তা খেয়ে এখানে ঘুরে বেড়াই।'

সে আমার দিকে তাকিয়ে কনুই দিয়ে মুখটা ঢেকে ফেলল। তারপর রক্তিম সলজ্জ হাসিতে ভরে উঠল মুখ।

'আপনার কি এই প্রথম?'

'হ্যাঁ। তুমি কে?'

'এই ধরুন একটা মানুষ, কিছুটা বলতে পারেন···।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তুমি কি বিবাহিত?'

'সে সম্মান এখনও কুড়োতে পারিনি।'

'ঠাট্টা করছ!'

'না, ঠাট্টা করছি না।'

সে চোখ আনত করল, তারপর বলল:

'তা হ'লে এসব মেয়েলী ব্যাপার জানলে কি করে?'

এবার আমায় ঠাট্টা করতে হল।

বললাম, 'শিখেছি। আমি একজন ছাত্র—ছাত্র কাকে বলে আপনি জানেন?'

'জানি। আমাদের পুরোহিতের বড় ছেলেটি একজন ছাত্র। সে পুরোহিত হবার জন্য পড়ছে।'

'হ্যাঁ। আমিও সেরকম একজন। যাই কিছু জল নিয়ে আসি।'

রমণীটি মাথাটা নীচু করে শিশুটির শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করে সমুদ্রের দিকে তাকাল।

'আমি একটু পরিষ্কার হয়ে নিতে পারতাম, কিন্তু এখানকার জল কেমন জানি না। জলটা কেমন? নোনতা, তেতো?'

'যান পরিষ্কার হয়ে আসুন—খুব ভালো জল।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ। ঐ নদীর জলের চেয়েও এই জল বেশী গরম—নদীর জল বরফের মত ঠান্ডা।'

'বলছ যখন…'

একজন আবখাজিয়ান একটা ঘোড়ার পিঠে বসে দু দিকে দুই পা ঝুলিয়ে হেঁটে চলার গতিতে চলছে—মাথাটা বুকের কাছে ঝুঁকে পড়া। তার শীর্ণকায় খুদে ঘোড়াটা কান দুলিয়ে, আমাদের দিকে গোল গোল জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে ভোঁস ভোঁস শব্দ করল। অশ্বারোহী ঝাঁকুনি দিয়ে মাথাটা তুলল। তার মাথায় রয়েছে জীর্ণ পশমের টুপি। আমাদের দিকে তাকিয়েই সে আবার মাথা নীচু করল।

'এলাকার মানুষগুলো কেমন অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর দেখতে', ওরেল মহিলাটি শান্ত গলায় বলল।

আমি জল আনতে গেলাম। পারদবর্ণ, স্বচ্ছ জলের স্রোত পাথরের উপরে লাফিয়ে এসে পড়ছে। ওর মধ্যে শরতের পাতারা আনন্দে ঘুরপাক খাচ্ছে। চমৎকার! আমি হাত মুখ ধুয়ে, কেটলিটা ভরে ফিরে এলাম। ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখলাম মহিলাটি হামগুঁড়ি দিয়ে এগুচ্ছে এবং উদ্বেগে বারবার পিছন ফিরে তাকাচ্ছে।

'কি ব্যাপার?'

সে চমকে উঠল, তার মুখ ফ্যাকাশে। সে শরীরের নীচে কি যেন লুকোতে চেষ্টা করছে। আমি বুঝতে পারলাম জিনিসটা কি।

'আমাকে দিন, পুঁতে ফেলছি।'

'ওঃ! বাছা আমার! কিন্তু এটা স্নানঘরে, কোন ছাদের নীচে পুঁততে হবে…।'

'আপনার কি মনে হচ্ছে এখানে শিগ্‌গির কেউ স্নানঘর তৈরী করবে?'

'তুমি ঠাট্টা করছ, কিন্তু আমার ভয় করছে! যদি কোন জন্তু খেয়ে ফেলে, তাহলে। এগুলো মাটির নীচে পুঁততে হবে।'

সে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে, আমার হাতে একটা ভেজা ভারী পোটলা দিয়ে লজ্জাভরে, নম্রস্বরে বলল:

'কাজটা ঠিকভাবে করতে হবে, অনেকটা গর্ত খুঁড়ে পুঁততে হবে, করবে তো? ঈশ্বরের দোহাই···আমার বাচ্চার দোহাই, ঠিকভাবে ক'রো, দোহাই··· ।'

আমি ফিরে এসে দেখি সে সমুদ্রের তীর থেকে আসছে। পা ফাঁক করে করে, হাত দুটোকে ছড়িয়ে আসছে। কোমড় পর্যন্ত তার স্কার্ট ভেজা, মুখ ঈষৎ লালচে, যেন ভেতর থেকে কোন আভা আসছে। আমি তাকে আগুনের কাছে নিয়ে এলাম। বিস্ময়ে মনে মনে ভাবছি:

'কি আসুরিক শক্তির বাবা!'

তারপর আমরা মধু দিয়ে চা খেলাম, সে শান্তভাবে প্রশ্ন করল:

'তুমি পড়া ছেড়ে দিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'মদ খাও নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, মদ খেয়ে শেষ হয়ে গেলাম, মা!'

'কি লজ্জার কথা! মনে আছে, সুখুমে যখন তুমি ম্যানেজারের সঙ্গে খাবার নিয়ে ঝগড়া করতে আমি তোমাকে দেখতাম আর মনে মনে বলতাম: ছেলেটা নিশ্চয়ই মাতাল, কাউকে ভয় পায় না।'

সে তার ফোলা ঠোঁট থেকে মধু চেটে নিল এবং যে-ঝোপের কাছে সেই সদ্যজাত ওরিয়েলটি নিশ্চিন্তে ঘুমচ্ছে সেখানে তার নীল চোখজোড়াকে বারবার ঘুরিয়ে নিতে লাগল।

'ভাবছি ও কিভাবে বড় হবে?' দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল। 'তুমি সাহায্য করেছ—সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, কিন্তু এটা কি ওর পক্ষে ভাল হবে,···আমি ভাবছি··· ।'

খাবার ও চা খাওয়া শেষ হ'লে সে নিজের উপর ক্রশ চিহ্ন আঁকল,

আর আমি আমার জিনিসপত্তর গ্‌ছিয়ে নিতে লাগলাম। সে শরীর দ্‌লিয়ে কিমতে লাগল। দৃষ্টি তার মাটির দিকে নিবদ্ধ—চোখ যেন আবার উদাস হয়ে গেছে। তারপর সে উঠে দাঁড়াল।

'সত্যিই যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি নিশ্চিত, আপনি চলতে পারবেন?'

'ভার্জিন মেরী আমার সহায়! ওকে আমার কাছে দাও!'

'আমি ওকে নিচ্ছি।'

কিছুক্ষণ তর্কাতর্কির পর সে রাজী হল এবং আমরা যাত্রা শুরু করলাম—পাশাপাশি, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।

'আশা করি আমি হোঁচট খাচ্ছি না', সে বিনীত হাসি হেসে বলল। তার হাত আমার কাঁধে।

রাশিয়া-ভূখণ্ডের নতুন বাসিন্দা, অজানা-ভাগ্যের' এই মানুষটি এখন আমার হাতের মধ্যে রয়েছে—সে তার নাক দিয়ে বড়দের মত শব্দ করছে। সমুদ্র সাদা ফেনায় অলঙ্কৃত হয়ে শব্দ করছে, গুঞ্জন তুলছে। ঝোপগুলো একে অপরের সাথে ফিসফিস্ করে কথা বলছে, সূর্য তার মধ্যগগনের আলো ছড়াচ্ছে।

আমরা ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছি। মা মাঝে মাঝেই থেমে দম নিচ্ছে। মাথা পেছন দিকে ঝাঁকিয়ে সে তার দৃষ্টি সমুদ্র, বন, পাহাড়, এবং শেষে তার ছেলের মুখের উপর রাখছে। যন্ত্রণার-অশ্রুতে-সিক্ত তার চোখদুটো পুনরায় বিস্ময়কর রকম নিস্তেজ হয়ে পড়ল। অফুরন্ত ভালবাসার নীল আলোয় সে দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

একবার সে থেমে বলল:

'ভগবান! হে ঈশ্বর, কি বিস্ময়কর এই শিশু! কি চমৎকার! আমি এর সাথে, আমার এই ছোট্ট শিশুটির সাথে এইভাবে পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত যেতে পারি—সে, আমার প্রিয় ছোট্ট খোকা, তার মায়ের বুকে স্বাধীনভাবে বড় হবে, আর বড় হবে···।'

সমুদ্রের মৃদুগর্জন উঠছে, আর উঠছে······।

# কমরেড

এ শহরের বিষয় অস্বাভাবিক ও দুর্বোধ্য। গীর্জার আকাশমুখী বিচিত্র গম্বুজ ছাড়িয়ে কল-মিলের প্রাচীর ও চিমনিগুলো মাথা উঁচু করে আছে। মনে হয়, বণিকদের ঘনসন্নিবিষ্ট অট্টালিকার প্রাণহীন ইট-কাঠ-পাথরের গোলক-ধাঁধায় গীর্জাগুলো ঝাপসা ও বিবর্ণ। যেন ধুলো ও ভস্মস্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে আছে কিছু সুন্দর ফুল। সকাল সন্ধ্যায় প্রার্থনাকারীদের উদ্দেশে গীর্জার ঘন্টার ধাতব আওয়াজ ছাদের লোহালক্করে আছাড় খেয়ে সুউচ্চ প্রাসাদের সঙ্কীর্ণতায় হারিয়ে যায়।

শহরে অট্টালিকার সংখ্যা প্রচুর এবং অধিকাংশই সুন্দর, অভিজাত কিন্তু ভিতরে বাসা বেঁধে আছে এক প্রকার নোংরা ও ঘৃণ্য জীব। উদ্বাস্তু ধেরে-ইঁদুরের মতো তারা কেবল ইতস্তত অলিগলিতে চলাফেরা করে। কেউ বা স্থূল আমোদ, কেউ বা লোলুপ দৃষ্টিতে রুটির সন্ধানে ব্যস্ত। এ ছাড়াও প্রকাশ্য রাস্তার মোড়ে মোড়ে কিছু মানুষ ভুখা, দুর্বলদের প্রতি এমন তীক্ষ্ণ, সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখছে যাতে প্রতিষ্ঠাবানদের প্রতি এই সব দীন-দরিদ্রের বিনম্র আচরণের কোন অভাব না ঘটে। স্বভাবতই প্রতিষ্ঠাবানরা হল শহরের ধনী সম্প্রদায়। এখানে অর্থ হল ক্ষমতা ও স্বাধীনতার সারবস্তু। প্রত্যেকেই ক্ষমতালোভী কারণ তারা গোলাম, তাই ধনীর বিলাস-ব্যসন গরীবের হিংসা ও ঘৃণার বস্তু এবং এ শহরে স্বর্ণালংকারের রিনিঝিনিই হল মৃদু ও মধুর সঙ্গীত। এখানে মানুষ পরস্পরের শত্রু এবং হিংস্র পথে চালিত।

কখনো-সখনো শহরের আকাশে আলো-ঝলমল সূর্যের সাক্ষাৎ মেলে, কিন্তু জীবন এখানে সর্বক্ষণ অন্ধকারাচ্ছন্ন ; মানুষগুলো যেন ছায়ামূর্তি। রাতে শহরের বুকে অসংখ্য উজ্জ্বল আলো জ্বললেই, ক্ষুধাতুরা কামিনীগণ সামান্য অর্থের আশায় ভালোবাসার ছলাকলা বিক্রীর উদ্দেশে পথে নামে। এ সময়ে বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্যের ঘ্রাণে উপবাসীর চোখজোড়া ক্ষুধার আগুনে নীরব ক্রোধে জ্বলতে থাকে—মনে হয় শহরের আকাশে বাতাসে দারিদ্র্যের ক্ষীণ, চাপা, যন্ত্রণাকাতর গোঙানী প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। জীবন এখানে বিষণ্ণ

ও উদ্বেগপূর্ণ। অধিকাংশেই বিপথে চালিত, অবশ্য কিছু সংখ্যক মানুষের পৌরুষ আছে, কিন্তু তাদেরও হৃদয় হিংস্রতা ও পশুশক্তিতে আচ্ছন্ন।

এখানে প্রত্যেকেই বেঁচে থাকতে আগ্রহী কিন্তু সঠিক পথ তাদের জানা নেই। কেউই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কাঙ্ক্ষিত জীবনযাত্রায় এগিয়ে যেতে সাহস পায় না। ভবিষ্যৎ স্বপ্নের উদ্দীপনায় কয়েকটি পদক্ষেপের পরই ভয়াবহ বর্তমান পিছন হটে আসতে বাধ্য করে। কারণ সে এখন ঘৃণ্য, লোভী এক দৈত্যের নিষ্ঠুর বাহুপেষণে আবদ্ধ। অসহায় এক মূক যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষ তাই জীবনের এই কুৎসিত রূপ দেখে শিউরে ওঠে। সে বীভৎস রূপ তার অন্তরে হাজার হাজার বিষণ্ণ ও অসহায় দৃষ্টি মেলে ভাষাহীন এক প্রার্থনা জানায়। অন্যদিকে ভবিষ্যতের উদ্দীপনাটুকু হারিয়ে যেতেই প্রতিটি মানুষের অক্ষম আর্তনাদ জীবনবেদীতে বিক্ষত আর দশটা হতভাগ্যের ক্রন্দনধ্বনির সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। এখানে ছায়ার মতো লেগে আছে বিষাদ ও উদ্বেগ —কখনও বা সন্ত্রাস। গীর্জা-আড়াল-করা পাষাণস্তূপকে বুকে নিয়ে, ধূসর অন্ধ শহর অসংখ্য মানুষকে উদরস্থ করে স্থিরনিশ্চল। যেন কারারুদ্ধ সে মানুষগুলো চিরদিন সূর্যের আলো থেকে বঞ্চিত থাকবে। এখানে জীবনের সঙ্গীত হল যন্ত্রণা ও ক্ষোভের চাপা ক্রন্দন, অবরুদ্ধ ঘৃণার মৃদু হিসহিসানি, ভয়সঞ্চারী নিষ্ঠুরতার উল্লাস এবং জৈবিক হিংস্রতার উন্মত্ততা।

## দুই

তবুও চারিদিকের এই দুঃখ, দুর্ভাগ্যের বিষণ্ণ আবর্তে, লোভ ও অভাবের পিচ্ছিল কবলের মধ্যে, আত্মম্ভরিতার চোরাবালিতে, সামান্য সংখ্যক স্বপ্নচারী সবার অলক্ষ্যে শহরের নীচুতলায় ঘুরে বেড়ায়। সেখানে বাস করে অগণিত সর্বহারা, যাদের শ্রমে গড়ে উঠেছে শহরের ঐশ্বর্য এবং ইমারত। ঘৃণা ও উপহাসের মধ্যেও মানুষের প্রতি অগাধ বিশ্বাসে স্বপ্নচারীরা বিপ্লবের বাণী প্রচার করে। এক কথায় তারাই হল খাঁটি সত্যের ভবিষ্যৎ অগ্নিশিখার এক একটি বিপ্লবী স্ফুলিঙ্গ। সেখানে তারা সর্বক্ষণ সরল, মহান শিক্ষার এক ক্ষুদ্র ফলপ্রসূ বীজ বহন করে বেড়ায়; কঠিন প্রত্যয়ে, হৃদয়ের মৃদু উত্তাপ ও ভালোবাসার শীতল সপ্রভ দৃষ্টিতে মানুষগুলোর ভারাক্রান্ত

জীবনের পক্ষে উজ্জ্বল, জলন্ত সত্যের বীজ বপন করতে থাকে—দীর্ঘদিন যাবৎ যে মানুষগুলো কেবল লোভী, অত্যাচারীদের হাতে মনুষ্যত্ব হারিয়ে নিছকই ঐশ্বর্য উৎপাদনকারী মূক পশুতে পরিণত হয়েছিল। নীচু তলার সেই-সকল মানুষে এক শব্দের ঝঙ্কারে কেমন বিহ্বল হয়ে থাকে, ঠিক বিশ্বাস করতে চায় না। অথচ তাদেরই শ্রান্ত হৃদয়গুলো সেই ঝঙ্কারের জন্য দীর্ঘদিন ব্যাকুল হয়ে ছিল। তাই এ শব্দের মৃদু ব্যঞ্জনায় শক্তিশালী উৎপীড়কের মিথ্যা ছলনার পাশ ছিন্ন করে মানুষগুলো ধীরে ধীরে আপন আপন মাথা তুলতে থাকে।

ক্রোধ-চাপা ধূসর প্রাত্যহিক জীবনে, নানা অন্যায়ের বিষে জর্জরিত হৃদয়ে, বিত্তশালীর মিথ্যা পান্ডিত্যের শিকার হয়ে, গ্লানি ও বঞ্চনায় আকণ্ঠ-নিমজ্জিত মানুষগুলোর কাছে যেন এক সুন্দর, উজ্জ্বল বস্তু নিক্ষেপিত হল ঃ 'কমরেড !'

শব্দটি এ মানুষগুলোর কাছে অপরিচিত নয়, তারা পূর্বেও শুনেছে, মনে মনে উচ্চারণ করেছে, কিন্তু তখন গতানুগতিক দশটা নীরস বস্তুর মতো মনে হয়েছে ফাঁকা ও বিবর্ণ। কিন্তু আজ সে এক নির্মল, সুস্থ, নতুন বার্তার ইঙ্গিত নিয়ে হাজির হয়েছে, যেন মহামূল্যবান এক হীরকখন্ড।

আন্তরিকভাবে এই মানুষগুলো কোমল অপত্যস্নেহে মনের মধ্যে শব্দটিকে পোষণ করে, অনেকটা স্নেহময়ী মায়ের সন্তানকে দোলায় দোল দেবার মতো। যতই সেই উজ্জ্বল শব্দটির গভীর মর্মস্থলে প্রবেশ করা যায়, ততই মনে হয় সুন্দর ও তাৎপর্যপূর্ণ। তাদের ঠোঁট মৃদু নড়ে ওঠে ঃ 'কমরেড !'

এ ধ্বনির মধ্যে তারা উপলব্ধি করে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী, স্বাধীনতার উচ্চশিখরে মাথা তুলবার আহ্বান এবং সমস্ত মানুষকে এক নতুন বন্ধনে আবদ্ধ করার স্পৃহা, যে বন্ধন হল মনুষ্যত্বে শ্রদ্ধা ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মান। এই গভীর অর্থবহ ধ্বনি যখন শহরের নিষ্পেষিত গোলামদের অন্তরে শিকড় বিস্তার করে, মনের দৈন্য ছিন্ন হয়ে যায়। একদিন তারাই এই শহুরের সম্ভ্রান্তদের উদ্দেশে বলে ঃ 'যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়।'

তখনই জনজীবন স্তব্ধ হয়ে যায় কারণ এরাই হল সচল জীবনযাত্রার মূল চালিকা-শক্তি। শহরের জলপ্রবাহ বন্ধ, চুল্লির অগ্নি নির্বাপিত, ঘন অন্ধকারে সুউচ্চ প্রাসাদগুলি নিমজ্জিত। মহাশক্তিধর ধনীদের মনে হয় অসহায়, অনাথ। ভয় তাদের গ্রাস করে। আপন জঞ্জালের পূতিগন্ধময় প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ হয়ে, নীচুতলার বিদ্রোহীদের প্রতি চিরদিনের ঘৃণাকে আপাত-দমন করে রাখে কারণ শহরের নীচুতলার মানুষদের বিপুল শক্তিতে এই সকল বিত্তশালীরা এখন বিস্ময়াভূত। ক্ষুধার বিভীষিকা তাড়া করে বেড়ায় এবং অন্ধকারে শোনা যায় শিশুদের করুণ আর্তনাদ। প্রাণহীন লোহা-পাথরে-ঠাসা প্রাসাদ ও গীর্জায় বিষাদের ছায়া, পথে-ঘাটে শীতল মৃত্যুর মতো অশুভ নীরবতা। এতদিন যারা শুধু রথের চাকাই টেনে গেছে, তারা সচেতন হয়ে ওঠায় জনজীবন স্তব্ধ। শহরের এই সকল গোলামরা এক যাদু-বলে যে অজেয় আত্মশক্তির সন্ধান পেয়েছে তা হোল সৃষ্টিশক্তি।

বিত্তশালীদের পক্ষে এ দিনগুলো বড় দুঃসহ। এতদিন যারা নিজেদের শুধু প্রভু বলে মনে করত, তাদের কাছে অন্ধকার রাত অনন্তপ্রসার* এবং বিষাদপূর্ণ। প্রাসাদের ক্ষীণ আলো এতই নিষ্প্রভ ও করুণ—মনে হয় শত বৎসরের প্রাচীন শহরটার মৃতদেহের ওপর রক্তলোভী এক দৈত্য ইট-কাঠ-পাথরের জঘন্য কুৎসিত চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। অন্ধ জানালাগুলো বিষণ্ণ ক্ষুধিত দৃষ্টিতে রাজপথের দিকে তাকানো, যেখানে চলছে জনজীবনের সত্যিকারের প্রভুদের আজ নতুন উদ্যমে পদচারণা। তারাও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ক্লান্ত, এমনকি গৃহে-আবদ্ধ মানুষগুলোর চাইতে একটু বেশীই, কিন্তু এ ক্লান্তি ধনীদের মতো তাদের অসহায় করে তোলেনি কিংবা হৃদয়ের উজ্জ্বল দীপশিখাকে এতটুকু নিষ্প্রভ হতে দেয়নি। বরং আত্মশক্তিতে উদ্দীপিত হয়ে তাদের চোখে মুখে জয়ের প্রত্যাশা। যে শহর এতদিন তাদের কাছে ছিল গুমোট, রুদ্ধকণ্ঠ এক কারাগার, যেখানে তাদের ভাগ্যে শুধু জুটত নিদারুণ অবজ্ঞা ও উপহাস এবং ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে জমে উঠত পাহাড় প্রমাণ অভিযোগের স্তূপ, সেই শহরের রাস্তায় আজ মানুষগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে মাথা তুলে। এতদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় তারা বুঝেছে শ্রমের তাৎপর্য, আজ সে আলোতেই জীবনের প্রভু হবার পবিত্র অধিকার সম্বন্ধে তারা সচেতন। তারা

শহরের নতুন সৃষ্টি ও বিধানকর্তা। তাই এক নতুন শান্তি, নবজীবনের বার্তাবহ অতি উজ্জ্বল শব্দটি বেজে উঠল : 'কমরেড !'

এ যেন বর্তমানের প্রবঞ্চনাময় হাজার শব্দের মধ্যে ভবিষ্যতের এক অমূল্য বাণীমন্ত্র। নতুন যে জীবনের জন্য এতদিন মানুষগুলো উন্মুখ হয়ে ছিল, আজ কি তার লগ্ন আগতপ্রায়, না এখনও তা মরীচিকা ? ব্যাপারটা তাদেরই স্থির করার কথা। যে-মুক্তির দিকে আজ তারা ধাবমান, এতদিন নিজেরাই তার আগমনকে বিলম্বিত করে তুলেছিল।

## তিন

অর্ধভুক্ত, পশুর-জীবনে-অভ্যস্ত যে গণিকাটি পথের মোড়ে সামান্য অর্থের বিনিময়ে নিজেকে নিষ্ঠুর পেষণের হাতে বিকিয়ে দেবার জন্য অপেক্ষমানা, তার কাছেও শব্দটা পেঁছাল। মৃদু হেসে হতবুদ্ধিপ্রায় হয়ে সে ধ্বনিটিকে পুনঃউচ্চারণে সাহস পেল না। গলির মোড়ে নবাগত এক পথিক এসে অতি প্রিয়জনের মতো গণিকাটির কাঁধে মৃদু স্নেহস্পর্শ দিয়ে বলে উঠল : 'কমরেড !'

উদ্বেলিত অশ্রুকে সেই হতভাগিনী সলজ্জ হাসির মধ্যে গোপন করে রাখল, কারণ এতদিনের কলুষিত হৃদয়ে এ আনন্দের স্বাদ তার কাছে নতুন। তাই এতদিন যে-চোখে সে পৃথিবীর দিকে ক্ষুধার্ত ও নির্লজ্জের দৃষ্টি দান করছে সেখানে দেখা গেল টলটলে পবিত্র কয়েক ফোঁটা অশ্রু। এই মুহূর্তে শহরের বুকে, পৃথিবীর সমস্ত নিষ্পেষিতদের, এক পরিবারভুক্ত এই সব অপাংক্তেয়দের আনন্দের হাসি পথে পথে আলোকমালার মতো জ্বলতে থাকলে সুউচ্চ প্রাসাদের নিষ্প্রভ জানালাগুলো নিষ্ঠুর ও অক্ষম দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

পথের ধারে যে ভিক্ষুকটির কাছে গতকালও বিরক্তিতে বিবেক-তাড়নায় কোনো স্থূল হাতের একটা ঘষা-আধলা ছিটকে পড়ত, আজ সেখানেও শব্দটি পেঁছে গেল। নতুন ভিক্ষালব্ধ বস্তুটিতে এতদিনের দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট হৃদয় আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় দুলতে থাকে।

উলিঙ্গদালি গাড়োয়ানটা এতদিন শুধু যাত্রীদের তাড়নায় দুর্বল ঘোড়াটাকে চাবুক মেরে দ্রুত ছোটবার জন্য ব্যস্ত ছিল। আজীবন চাবুকের হিসাহিসানি ও শক্ত রাস্তায় চাকার আওয়াজ শুনে শুনে তার চেতনা হয়ে গিয়েছিল ভোঁতা। সেও আজ মৃদু হেসে পথিককে জিজ্ঞেস করল:

'গাড়ির দরকার কমরেড?'

তার মস্ত লাল মুখে একদিকে হাসির ছটা, অপরদিকে ভয়ে পথিকটির কাছ থেকে লাগাম গুটিয়ে দ্রুত পালাবার চেষ্টা। পথিকটি মৃদু হেসে মাথা দুলিয়ে জবাব দিল: 'না কমরেড, আমি বেশীদূর যাব না।'

রাস্তায় চাক চাক জনতার গুঞ্জন। সমস্ত বিশ্বকে আপন করবার মহাশক্তিধর স্ফুলিঙ্গের মতো শব্দটাকে নিয়ে রাস্তায় মানুষগুলো আপন আপন হৃদয়ের মধ্যে লোফালুফি করতে লাগল: 'কমরেড!'

মস্ত গোঁফ নিয়ে ধূসর পোষাকের এক পুলিশ গম্ভীর চালে ছোটখাট একটা ভিড়ের সামনে এল। সেখানে পথসভা করছিল এক বৃদ্ধ। খানিক তার বক্তব্য শুনে পুলিশটি ফিস্‌ফিস্‌ করে উঠল:

'পথসভা নিষিদ্ধ ভদ্রমহোদয়গণ,···আপনারা যে যার কাজে সরে পড়ুন।'

মুহূর্তের নীরবতায়, আনত দৃষ্টিতে সেও গোপনে বলে উঠল: 'কমরেড!'

বিশ্বভ্রাতৃত্বের গভীর অর্থবহ শব্দটাকে যারা অন্তরে স্থান দিয়ে অস্থি-মজ্জায় মিশিয়ে নিয়েছে, তাদের চোখেমুখে নতুন জীবন-সৃষ্টির গর্ব। এ শব্দের মধ্যে তারা যে শক্তি খুঁজে পেয়েছে তা অফুরন্ত ও অজেয়।

এ'হেন মানুষদের বিরুদ্ধে পুরাতন অত্যাচারীরা ধূসর কিছু অস্ত্রধারী নামিয়েছে, তারা রাস্তার মোড়ে মোড়ে সার বেঁধে এমনভাবে প্রস্তুত, মনে হয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেগে উঠবার জন্য এখনই শুরু হবে দমন-পীড়ন।

কবে কোন মানুষের হাতেগড়া, কঠিন প্রাচীরে ঘেরা পুরাতন শহরটির অন্ধ-গলির অভ্যন্তরেও মনুষ্যত্বের প্রতি এক সুগভীর অনুরাগ ছড়িয়ে পড়তে লাগল: 'কমরেড।'

যত্রতত্র স্ফুলিঙ্গ জ্বলছে। সেখান থেকেই দুনিয়ার মানুষকে সম্বন্ধ করার দাবানল সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করবে। ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংস্রতা—যা মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে আনে—একে একে সে-আগুনে দগ্ধ হবে। তারপর প্রতিটি মানুষের হৃদয় গলে গলে পরিণত হবে একটি হৃদয়ে। সে হৃদয় হল মুক্ত দুনিয়ার ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে-আবদ্ধ সমস্ত শ্রমিক পরিবারের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একটি মহান উচ্চ হৃদয়।

দাসত্বের-বন্ধনে-আবদ্ধ মানুষের হাতে-তৈরী মৃত শহরের পথে পথে, এত দিনের হিংস্র কুটিল শহরের পথে পথে, মানুষের আত্মবিশ্বাস নিজের ও পৃথিবীর অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে জয়লাভ করছে। ক্রমশই সে নতুনতর শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠছে। চাপা অস্বস্তিকর, বিষাদময় পরিবেশে উজ্জ্বল, সপ্রতিভ, আলোকবর্তিকার মতো সরল আন্তরিক শব্দটা ভাস্বর হয়ে উঠল: 'কমরেড!'

# কবি

জিমনাস্টিক ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরে স্নুরা পোষাক পাল্টে সোজা চলে এল খাবারঘরে। লক্ষ্য করল টেবিলে বসে মা তাকে দেখে মুচকি হাসছে। বিষয়টা একটু অস্বাভাবিক। স্বভাবতই এ পরিস্থিতিতে স্নুরার কৌতূহল জাগে। কিন্তু সে আর এখন ছোট্ট খুকিটি নয়, ভারিক্কি হতে চলেছে; অহেতুক প্রশ্ন করে কৌতূহল প্রকাশ করা তার সম্ভ্রমে বাধে। মায়ের কপালে ছোট্ট চুমু খেয়ে, আয়নায় একঝলক নিজের চেহারাটি দেখে চেয়ারে বসে পড়ল। এখানেও অন্যান্য দিনের তুলনায় কিছু অস্বাভাবিকতা। টেবিলটি সুসজ্জিত এবং পাঁচজনের আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাহলে বিষয়টি আর কিছুই নয়, অতিরিক্ত কাউকে হয়তো খাবার টেবিলে আমন্ত্রণ জানান হয়েছে। সামান্য হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। মা বাবা এবং কাকিমার সমস্ত বন্ধু-বান্ধব তার পরিচিত। তাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যে নাকি স্নুরার কাছে চমৎকার এবং মজার মানুষ। ভগবান! কিরকম সব একঘেঁয়ে তারা। কিরকমভাবে পরিস্থিতিটাকে বিরক্তিকর করে তোলে! উদাসীন ভঙ্গিতে মাকে বাড়তি চেয়ারটা দেখিয়ে বললো, 'কার জন্য?' কিছু বলার আগে মা কব্জিঘড়ি ও দেয়ালঘড়ির সময় মিলিয়ে, জানলার দিকে তাকিয়ে কান খাড়া করে কিছু শুনবার চেষ্টা করল। শেষে স্নুরার দিকে মুখ ঘুরিয়ে মুচকি হেসে বললো, 'আন্দাজ করো না!'

'উঃ, মজা করছ কেন?'—বলেই স্নুরা বুঝতে পারলো আবার সে দারুণ কৌতূহলী হয়ে উঠছে। তার স্মরণ হলো এবার, বাড়িতে ঢোকবার সময় ঝি লুবে মাসী দরজা খুলে অস্বাভাবিক ভাবেই বলেছিলো, 'এসে পড়েছ? বাঃ খুব খুশি হলাম।'

তার ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে লুবার খুশি হওয়া খুব বিরল ঘটনা, তা আবার এমন জোর-গলায় প্রকাশ করা! স্নুরা খুব ভালভাবেই জানে এক-ঘেঁয়ে গৃহজীবনের বাঁধা-বন্ধ রুটিনের মধ্যে সামান্য পরিবর্তনের হাওয়া ঢেউ

তুললেই তা অন্তরদৃষ্টিতে ধরা পড়ে যায়, কারণ বৈচিত্রের জন্য তার চিত্ত সদা-চঞ্চল।

'হ্যাঁ, হয়তো ঘটনাটা খুব মজাদারই হবে। ভাবতে চেষ্টা করোনা!' মা একইভাবে রহস্য করল।

ল্যুবোমাসীর কথাবার্তার ধরন থেকেই সে নিশ্চিত ছিল একটা কিছু আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, বেশ আশ্চর্যজনক কিছু। কিন্তু যেচে জিজ্ঞেস করায় সে উৎসাহী ছিল না।

'আর কি! কোথা থেকে কেউ হয়তো আসবে, এই তো?'—কৌতূহল চেপে রাখল সে।

'সেতো ঠিকই'—মা মাথা নাড়লেন, 'কিন্তু কে?'

'জেনিয়া কাকা'—আন্দাজে ঢিল মেরেই তার গালদুটো লাল হয়ে উঠল।

'না, না, কোন আত্মীয় নয়। এমন একজন যার সম্পর্কে তুমি পাগল।' সুরার চক্ষু ছানাবড়া। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে মায়ের গলা জড়িয়ে উৎসাহে ফেটে পড়ল, 'সত্যি? সত্যি বলছো মা?'

'ছাড়! ছাড়!'—হাসতে হাসতে মা মেয়েকে ঠেলে, দূরে সরিয়ে দেয়। 'একেবারে দুষ্টু মেয়ে! দাঁড়া, সব আমি ওনাকে বলবো।'

'মা, মা, ক্রিমস্কি? এসেছেন? বাবা আনতে গেছেন? জিনা কাকিমাও? যে কোন মুহূর্তে তাঁরা হাজির হবেন…মা, মা, আমার ছাই-রং-এর পোষাকটা পরব! উঃ, তাঁরা আসছেন! এখানেই আসছেন! উত্তেজিত ও উদ্ভাসিত হয়ে মায়ের চেয়ারের চারপাশে সে লাফাতে শুরু করল, ছুটে গেল আয়নার সামনে; মুহূর্তের মধ্যে পোষাক পালটাতে হবে ভেবে যখন শুনল সদর দরজা বন্ধ, আবার আয়নার সামনে ফিরে চুলে আলতো আঙুল বুলিয়ে ধীরে চেয়ারে বসে চোখ বুজে হঠাৎ-উত্তেজনা দমন করার চেষ্টা করতে লাগল। নয়ন-যুগল খুলবে, ক্রিমস্কিকে দেখতে পাবে এই ঘরের মধ্যে, হাতখানেক তফাতে, চেয়ারে উপবিষ্ট! যে-কবির কবিতা পড়ে পড়ে সে পাগল, যাকে তার জিমনাস্টিক ক্লাবের সবাই মনে করে আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠকবি! কি শান্ত, ধ্বনিব্যাঞ্জক, স্নেহস্পর্শ, মধুর কবিতা! ভগবান! এইমুহূর্তে তিনি সশরীরে উপস্থিত হবেন, সুরার আনন্দ হবে

বলবেন, কথা বলবেন, পাঠ করবেন এমন কবিতার লাইন যা সদ্য তিনি সৃষ্টি করেছেন। জিমন্যাস্টিক ক্লাবের মেয়েরা কেউ তা শোনার সুযোগ পায়নি। আগামীকাল গর্বে সে তাদের কাছে বলবে, 'ক্লিমস্কি যা লিখেছেন, তোমাদের পড়া উচিত।'

'কোন লেখা?' তারা জিজ্ঞেস করলেই, সুরা আজকের কবিতাগুলো আবৃত্তি করে শোনাবে। স্বভাবতই তারা যখন জানতে চাইবে কোথায় সে এগুলো পেল, সুরা বুক ফুলিয়ে—বেশ বুক ফুলিয়ে জবাব দেবে যে কোথাও ছাপা হয়নি এখনো···গতকালই ক্লিমস্কি স্বয়ং সুরাদের বাড়ি খাবার-টেবিলে তার সামনে আবৃত্তি করেছিলেন। কি রকম বিস্মিত হবে ওরা! হিংসের জ্বলবে! ঐ প্যাঁচালো বুদ্ধির কিকিনা—মুখে ঝামা ঘষে দেয়া যাবে! ওকে শিক্ষা দেয়া যাবে বোনকে-শেখাতে-আসা কোন গায়িকার চেয়ে কোন কবির সঙ্গে পরিচয় থাকা কত উঁচুদরের। তারা জিজ্ঞেস করবে, 'সুরা, আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দে না।' এবং—আচ্ছা, উনি যদি সহসা ওর প্রেমে পড়ে যায়? এটা অসম্ভব কিছু নয় কারণ তিনি কবি। সচরাচর কবিরা প্রেমের ব্যাপারে বেশ দুর্বল।

আচ্ছা, কি ধরনের গোঁফ রাখেন তিনি? তাঁর চোখজোড়া? নিশ্চয়ই, আয়ত এবং বিষণ্ণ। আঁখিপল্লবে রাত্রি জাগরণের কালচে ছাপ। নাকটিও নিশ্চয়ই টিকোলো, ছোট। গোঁফটি নিশ্চয়ই কৃষ্ণবর্ণ হবে। তার সামনে হাত কচলে, হাঁটুগেড়ে বলবে, "সুরা! সুরা! তোমাকে দেখামাত্রই, 'জীবনের নূতন ঊষার উদয় হলো, হৃদয়ে কাঁপন তোলে আশার আলো।···এলে শুধু তুমি, তুমিই এলে। শপথ করি, হৃদয় তোমায় চিনতে ঠিকই পেলো'।" যাঃ, এ লাইনগুলোতো কবিতায় উনি লিখেই ফেলেছেন। তা'লে··· !

'দমচাপা, ধুলো, তার উপর বীভৎস একটা গন্ধ—সারারাত মশাই ঘুমোতে পারিনি'—কথাবার্তার আওয়াজে সুরা স্বপ্নলোকের বিচরণ ভঙ্গ করে বাস্তবের সম্বিতে ফিরে এল। কণ্ঠস্বরে যদিও উচ্চব্যক্তির কর্কশ ও স্বেচ্ছাচারীতার সুর ছিল, সুরার কানে লাগল কোমল ও আকর্ষণীয়। চোখ খুলে উঠে দাঁড়াতেই দেখতে পেল কালো ভেলভেটের জ্যাকেট, ধূসর রংয়ের প্যান্ট পরিহিত দীর্ঘকায় একজন পুরুষ সুরার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

'শুভদিন, ভদ্রমহিলারা ! আমাকে ভুলেই গেছেন, তাই না ?'

'আমি !' —সুরা দ্বিধাচিত্তে বলে উঠলো, 'আপনার কবিতা আমি সর্বদাই পাঠ করি, অবশ্যি শেষবার যখন এ বাড়ি এসেছিলেন, অনেক ছোট ছিলাম আমি।' 'এখনতো বেশ ভারিক্কিই লাগছে,' তির্যক দৃষ্টিতে এক ঝলক দেখেই উনি হাসতে হাসতে বলে উঠলেন। আরও কিছু বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলেন।

যেমন বয়স্ক ব্যক্তিরা করে থাকেন ; চেয়ারে দেহটি এলিয়ে দিতে দিতে সুরার বাবাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'বাঃ, তোমার ঘরটি বেশ খোলা-মেলা, আরামদায়ক, মিখাইল।'

নতমস্তকে নখ খুঁটতে খুঁটতে সুরা চকচকে প্লেটে কবির হাসিহাসি মুখটির প্রতিফলন দেখতে পেল। কবির ধূসর রংয়ের প্যান্ট, লোম-ছাঁটা মাথা এবং সরু লাল গোঁফটি সুরার ঠিক মনে ধরল না। উঃ, কি নিরস ! ছন্দহীন ! এমনকি চাঁছা নীল গাল, থুতনি এবং ঠোঁট নাড়াবার ভঙ্গিটি পর্যন্ত ! চোখজোড়া অত্যন্ত সাধারণ, যে কেউ বলবে প্রাণহীন ; পাতাগুলো যেন খুলে পড়তে চায়। কপালটা বলিরেখায় ঠাসা। বলতে কি, সুরার দেখা বিভিন্ন ডাকঘরের সাধারণ এক কেরাণীর মত লাগছে ওনাকে। তাঁর হাব-ভাব চেহারায় ছিঁটেফোঁটাও কবিস্বভাব নেই। হাতজোড়া ? সুরা চোরা চাউনি দেয়। মনে হয় বেতোরুগীর মতো স্থূল, আঙ্গুলগুলিও বেঁটে, মোটা। একটি আঙ্গুলে আবার দামী পাথরের আংটি পরেছেন। বিষাদে সুরা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

'তুমি তা'লে আমরা কবিতার পাঠিকা ?'

কবি সুরার উদ্দেশে বললেন। সম্মতি জানিয়ে সুরা রক্তিম হয়ে ওঠে।

'খুব ভাল ! কথা হচ্ছে, তোমার কি ভাল লাগে ?'

'বলতে ! আপনার লেখা নিয়ে ওরা সব পাগল'—মা জবাব দিলেন।

'বাঃ, এ আপনি চাটুকারিতা করছেন।'

'মোটেই না, মিথ্যে কথা !' —মায়ের কথার প্রতিবাদ করল সুরা, কিন্তু কবির কথার পৃষ্ঠে অর্থটা দাঁড়াল উল্টো।

খুব লজ্জা লাগছে সুরার, এ পরিবেশে নিজেকে বোকা বোকা ঠেকছে ঃ মা, বাবা, কাকা এবং উনি—প্রত্যেকেই হাসছেন। কি একটা কারণে উনি চোখ তুললেন, সমস্ত মুখটায় মনে হল ভাঁড়ামির ছাপ। উনি অমনভাবে ভুরুযুগল তুললেন কেন ? সবার সঙ্গে এত হাসিমসকরারই বা কি দরকার। তিনি তো একজন কবি, অত্যন্ত অনুভূতিশীল এবং বুদ্ধিদীপ্ত হওয়া উচিত ওনার। সুরার এই লজ্জা পাওয়ায় উনি কি মজা পাচ্ছেন ? অন্যান্যরা যেমন পায় ? উনি দশটা মানুষের মতো অতি সাধারণ ? সম্ভবতঃ ও প্রথমদিকে উনি সবার সঙ্গে খাপখাওয়াতে চেষ্টা করছেন, পরেই ওনার ব্যবহারে স্বকীয়তা ফুটে উঠবে।

'কোন ক্লাশে পড়, সুরা ?

'ক্লাশ সিক্স।'

এ কথা জানতে চাইলেন কেন উনি ? সুরা নাম ধরেই বা ডাকলেন কেন ? 'কোন শিক্ষকমশাইকে তুমি বেশি পছন্দ করো ? মনে হচ্ছে, আঁকার মাষ্টারমশাই ?'

'না, সাহিত্যের।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, সাহিত্যের শিক্ষক,'—চাপা হাসির রোল উঠল। মনে হলো সুরা টুকরো টুকরো হয়ে বিক্ষত হচ্ছে, কে যেন দেহের মধ্যে ফুটিয়ে দিচ্ছে হাজার হাজার আলপিন। এই মুহূর্তে, টেবিল পরিত্যাগ করে নিষ্কৃতি পেতে চাইল সে। খুব নিরাসক্ত লাগছে, মনে হয় আর সে চোখের জল ঠেকিয়ে রাখতে পারবেনা। এভাবে নিজেকে মেলে ধরল কেন সে ? আত্মাভিমানে কাঁপতে কাঁপতে সে কবির দিকে তাকালো। চোখজোড়ায় ক্রোধ ও চিত্তচাঞ্চল্যের এক অদ্ভুত মিশ্রণ। ভয় হচ্ছিল, সব কথাগুলো বলার আগেই সাহসের বাঁধটি তার ভেঙ্গে পড়বে ; তাই টেবিলটি আঁকড়ে এক নিঃশ্বাসে শুরু করলো, 'উত্তরটা কি খুবই ছেলেমানুষী মনে হলো আপনার কাছে ? কিন্তু কথাটা খুবই সত্যি। স্কুলের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক বলে আমরা তাঁকে ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। তিনি, বলতে পারেন আশ্চর্য সুন্দর করে, পড়িয়ে শোনান সব রকমের বই, সাহিত্যের যেকোন নতুন দিক তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেন। সবদিকচ্ছ মিলিয়ে, উনি অত্যন্ত ভালো মানুষ। আপনি যাকে

যদি জিজ্ঞেস করতে পারেন, আমাদের ক্লাশ কি উ'চু ক্লাশ, সবাই এক কথা বলবে। আপনার হাসির কারণটা কি জানতে পারি ? অবশ্য, আমি...'

'সুরা ? কি হয়েছে তোমার ?' বাবা গম্ভীর আওয়াজ দিলেন।

'আমরা ছোট্ট মহিলাটিকে আঘাত দিয়েছি'—ধীরকণ্ঠে ক্রিমস্কি বলে উঠলেন, 'আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।'

তাঁর ক্ষমা চাইবার ধরনটি সুরার কানে কর্কশভাবে বাজল। মনে হলো কথাগুলোর মধ্যে আদৌ আন্তরিকতা নেই এবং সুরার কি মনে হতে পারে সে ব্যাপারে মোটেই চিন্তিত নন। উপরন্তু, এ পরিস্থিতিতে নিজেকে অনাহূত মনে হচ্ছে, কেউ যেন তার উপস্থিতি কাম্য মনে করছে না। আত্মগ্লানিতে, খাওয়ার টেবিলে সে বসে রইল। হৃদয় ভারাক্রান্ত হলো করুণ বেদনায়।

'এই তা'লে উনি ! আবার কবি ! আর দশটা মানুষের সঙ্গে কোন প্রভেদ নেই'—খাওয়ার পর নিজের ঘরের জানালায় বসে ভাবতে শুরু করল সে। জানালার ওপাশেই তার প্রিয় লাইলাকের ঝোপ, বাগান। এমন-ভাবে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, জীবনে এই প্রথম যেন দর্শন-মুগ্ধ হচ্ছে।

'দশটা সাধারণ মানুষের মতো ! কিন্তু কেন, তা'লে বাবাও কবিতা লেখেন না কেন ? উনি কি কবির চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট ?'—কবির কিছু কবিতার লাইন মনে এলো তার। কি ঐকান্তিক ! কি উদ্দীপক ! কি বেদনাবিধুর কোমল ছন্দের ছটা ! "খেতে খেতে একবারও তিনি সে ভাষায় কথা বললেন না। তিনি শুধু কলম দিয়ে লিখতেই অভ্যস্ত, যেমন সোনিয়া, সাজাকোভা কাগজ দিয়ে ফুল বানাতে যন্ত্রের মতো অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষ তার এ ক্ষমতায় হিংসে করে কিন্তু উনি হেসে বলেন, 'এ আর এমন কি ! খুব সোজা'।"

বাগান থেকে কিছু কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে এল। বাবা এবং ক্রিমস্কি আছেন ওখানে। লাইলাক ঝোপটার ঠিক পেছনের বেঞ্চটায় যদি ওনারা বসেন, সুরা সব কথাই শুনতে পাবে। ঘাড়টা বাঁকিয়ে সে দেখতে থাকে কোথায় বসেন ওনারা।

'নতুন বইটা কেমন বিক্রী হচ্ছে তোমার ?'—বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

'খারাপ না। দ্বিতীয় মুদ্রণের কথা ভাবছি আমি। কিন্তু লোকগুলো

কৌতূহলে যত কিনছে, ততটা কবিতাকে ভালবেসে নয়। বইটা বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে হতভাগা সমালোচকগুলো অপসংস্কৃতি, অপসংস্কৃতি বলে চেঁচাতে শুরু করেছে। আর লোকগুলোরও সুড়সুড়ি লাগছে দেখি অপসংস্কৃতিটা কি বস্তু! এ শব্দটা নিয়ে অনেক চ্যাঁচামেচি হয়েছে যার কোন মানেই হয় না। যাক্, আখেরে লাভ হলো আমারই। হুড়হুড় করে বইটা কেটে গেল।'

ক্লিমস্কির কণ্ঠে দুশ্চিন্তার ছাপ, তবুও প্রতিটি কথায় ফুটে উঠছিল ক্রোধ। জানলায় বসা সুরার অন্তরে কথাগুলো প্রতিধ্বনি তুলছিল।

'হ্যাঁ'—বাবা বললেন, 'সমালোচকরা তো লেখকদের উপর খড়্গ হস্ত।'

"ওদের কথা হচ্ছে কবিরা সাধারণ মানুষের ক্রোধ ও আর্তনাদের কাব্যিক রূপ দেবে। নিজস্ব জগতে বসে তারা ভাবে মানুষের শুধু ক্রোধ আর আর্তনাদই আছে। জঘন্য! ওরকম মানুষ আমরা তো জীবনে দেখিনা। সাধারণ মানুষ বলতে তো কিছু মূর্খ আর কিছু আত্মসুখী, এর বাইরে কি আছে? আমাদের সমালোচক মশাইদের এ বিষয়টি মগজে ঢোকে না। তাঁরা শুধু বইয়ের ধুলোই ঘাটে, জীবনের সঙ্গে যোগ নেই। নেই কোন ঐতিহ্য বা নতুন চিন্তার সঙ্গে পরিচয়। তরুণেরা? 'তরুণেরা আজকাল অকালবৃদ্ধ হয়েই জন্মায়, বন্ধু'—কে যেন বলেছিল কথাটা। খুবই সত্যকথা। কাব্য-টাব্য ওদের বোঝার বিষয় নয় এমন কি আত্মার শুদ্ধির ব্যাপারেও ওগুলো নিরেট। যাক, এ প্রসঙ্গ থাক্···তোমার মেয়েটি কিন্তু ভারী সুন্দর!"

'ও তো জন্ম থেকেই কবি! বোধহয় লক্ষ্য করেছ ব্যাপারটা?'

'ওনাকে ধন্যবাদ!'—আপন মনে ফিসফিস করে সুরা আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠল। ওনার কথাবার্তা থেকে সিদ্ধান্ত করল অহেতুক সে ওনার বিরুদ্ধে মনে মনে অভিযোগ করেছিল, ঠিক বুঝতে পারেনি ওনাকে। পুনরায় সুরার কল্পনায় উনি একজন যথার্থ কবি হয়ে উঠলেন। তখনই বাগান থেকে ভেসে এল প্রশংসার বাক্য।

'হ্যাঁ, ভালো কথা, অশোভন হলে ক্ষমা করো, তোমার সেই···'

'আমার সেই স্ত্রীর খবর? জানিনা কোথায় আছে এখন। বছর দুয়েক আগে শুনেছিলাম ককেশাস অঞ্চলের কোন এক স্কুলে মাস্টারি করে। উঃ, ওর

কথা ভাবলেই গায়ে কাঁপুনি দেয়। জগতে কিছু কিছু মেয়েছেলে আছে যাদের গুণ বা মুখশ্রীতে উদ্দীপ্ত হওয়া তো দূরের কথা, শিউরে উঠতে হয়। ওর সান্নিধ্যে মনে হোত যথার্থই আমি একজন ভীরু হয়ে উঠছি, যেন আমি একজন পাপী। ওর আসল স্বরূপ আবিষ্কারের পর, আমার জন্য আমি জীবনে এমন অনুকম্পা বোধ করিনি। মনে হোত অহেতুক কোন খ্রীষ্টানের আত্মা কষ্ট পাচ্ছে। বিরক্তিকর একঘেঁয়ে! বলছিলাম, আমাদের জন্য চা আসবে কখন?'

'এই এলো বলে! কিন্তু যেটা আমি জানতে চাচ্ছি তা হলো—তুমি কি ফের বিয়ে করেছ, না অবিবাহিত?'

'অবিবাহিত, সেই মে মাস থেকেই। সারা শীতকালটা আমি এক রূপসীর সঙ্গে কাটালাম। বুঝলে বন্ধু, সে এক দারুণ ব্যাপার! মেয়েটি আমার গুণমুগ্ধা; দেখতে ঠিক এক টুকরো আগুন, শিক্ষা-দীক্ষাও আছে; তা হলেও মেয়েটি ছিল জড়বুদ্ধিসম্পন্না। আমাদের পরস্পরের পরিচয় নিছকই দুর্ঘটনা—অন্তত আমার তরফে কোন পরিকল্পনা ছিল না। ঘটনাটা ঘটেছিল একটা পিকনিকে; বেশ খানিকটা টেনে মৌজে ছিলাম আমি। শয়তানই জানে কি করে সে আমার ফ্ল্যাটে চলে এল। সকালে ঘুম থেকে উঠে চোখ মুছতে মুছতে ভাবছি, সেকি! আমি বিবাহিত। নিজেকে ধন্যবাদ জানিয়ে, পোষাক পরে পরবর্তী ঘটনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।'

বাবা হো হো করে হেসে উঠলেন। সুরার মনে হোল হাসিটা অন্তর বিদীর্ণ করে দিয়ে গেল। ভয়ানক আঘাত পেল সে।

'বলতে চাচ্ছ সাক্ষাৎ বিষধর? তারপর?'

'হ্যাঁ, মেয়েটি ঘুম থেকে উঠল। দেখলাম তার চোখে জল; তারপর যা হয়, চুম্বনের বন্যা বইয়ে অনেক কিছু শপথ করলাম তার কাছে। সপ্তাহখানেক ধরে পরিপূর্ণ ডুবে থাকার পর, আমার ক্লান্তি এসে গেল।'

'মেয়েটার বাবা-মা ছিলোনা?'

"তাদের কথা সম্পূর্ণ চেপে গেছল। তারপর, ধীরে ধীরে, স্বাভাবিক জীবন শুরু হতেই, ঝামেলার আরম্ভ। শয়তানই জানে কেন। প্রথমেই

মেয়েটা প্রমাণ করতে চাইল আমার সন্দেহ, কোমল ছন্দ-লালিত কবিতার সঙ্গে আমার প্রেসিংগোউনটির কোন মিল নেই। বলব কি তোমায় বাট রুবল দিয়ে কিনেছিলাম ওটি! প্রতিবাদ করতেই, ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে কাঁদতে শুরু করল। সে এক দৃশ্য বটে! দ্বিতীয়ত, তার ধ্যান-ধারণায় কবি হলো এমন এক স্বর্গীয় সৃষ্টি যার বাড়িতে কোন আড্ডার জায়গা থাকা উচিত নয়। অন্যের কথা বাদ দিলাম, মনের দিক দিয়ে বিচার করলে কবির কাছে অন্য কবিরাও তো আড্ডা দিতে আসবে। উঃ, কোন শয়তান যে আমাদের মেয়েদের এ সব উদ্ভট চিন্তা ঢেলে দিয়েছে! এর পরই বিবাদ, কান্নাকাটি, সন্তান চেয়ে গিন্নি-বান্নি হওয়ার জন্য ঘ্যানঘ্যানানি—সব কিছু চেয়ে দাবি আর দাবি। শেষকালে, পালিয়ে এসে চিঠিতে কয়েকটা লাইন লিখলাম, 'এ সব কিছুর উপর কোন কবির আগে দরকার স্বাধীনতা'।"

'বেশ, তার পরের ঘটনা?'—বাবা মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

'মাসে মাসে ছাব্বিশ রুবল পাঠিয়ে দিই।'

সুরার সমস্ত অনুভূতি শীতল, স্নায়ুগুলো কাঁপছে; উদাসদৃষ্টিতে জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল সে।

'তাই তোমার ইদানিং লেখাগুলো নৈরাশ্যে ভরা!'

"তুমি কি আমার এ বইটা পড়েছ, 'বহুবর্ণ স্মৃতির পোষাক রাত্রির অন্ধকারে বিদীর্ণ হয়ে যায়'?"

'বাঃ!'

'ও বইটাতে আমি এই বিশ্রী কাহিনীটার স্মৃতি বর্ণনা করেছি।'

'সুন্দর বর্ণনা হয়েছে'—বাবার দীর্ঘশ্বাস উঠল, "তুমিতো, সবদাই বর্ণনার রাজা। সেই যে লাইনটা, 'আবেগের অস্পষ্ট নকশার মালা'।"

'দেখছি, খুব খুঁটিয়েই আমার বই পড় তুমি!'

'তা ঠিকই। সামনে বলে চাটুকারি করছিনা, সত্যিই তোমার কবিতা আনন্দ দেয়।'

'ধন্যবাদ। এ প্রশংসা তো বেশি শুনতে পাইনা, যদিও সত্যি বলতে কি, জানি আমি এ প্রশংসার যোগ্য।'

'নিঃসন্দেহে, বন্ধু! চলো চা পান করা যাক।'

'একটু লক্ষ্য করো আধুনিক কবি এবং কবিতার উপর ; মানুষগুলো তো কবি নয়, এক একটি শকুন। ভাষাকে ওরা ধর্ষণ করছে, গলিয়ে-পচিয়ে দিচ্ছে। বরঞ্চ আমি যত্ন নিয়ে চেষ্টা করছি...'

সুরা লক্ষ্য করল বাবা এবং কবি পরস্পর কোমর জড়িয়ে পাশাপাশি বাগানটা পেরিয়ে যাচ্ছে। ক্রমে তাদের কথাবার্তাগুলো অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে গেল।

'সুরা সোজা উঠে দাঁড়াল। মনে হচ্ছে ভারী কিছু বস্তু তাকে চেপে রাখতে চাচ্ছে, নড়তে দিচ্ছে না।

'সুরা, এস চা তৈরী'—মায়ের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে। আয়নায় চোখ পরতেই দেখল, তার মুখটা ফ্যাকাশে, লম্বা এবং ভীত। অশ্রুবাষ্পে চোখদুটো ঝাপসা। খাওয়ার-ঘরে ঢুকতে মনে হলো পরিচিত মুখগুলো অবয়বহীন, অস্পষ্ট সাদা সাদা কিছু বিন্দু।

'আশা করি তরুণীটি আর আমাদের উপর রাগ পোষণ করছে না'—কবির কণ্ঠ শোনা গেল।

সুরা জবাব দিল না। তাঁর লোম-ছাঁটা মাথাটার দিকে তাকিয়ে স্মরণ করতে চেষ্টা করল, যখন প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিলনা নিছক কবিতা পড়ে মানুষটার সম্পর্কে কি কল্পনার স্বর্গ তৈরী করেছিল।

'সুরা, কথার জবাব দিচ্ছনা যে ? এ কি অভদ্রতা হচ্ছে !' বাবা, চেঁচিয়ে উঠলেন। সুরার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ল। চীৎকার করে বলল, 'কি চাও, কি চাও তোমরা আমার কাছে ? একা থাকতে দাও আমায়। যতসব ভন্ড !' ফোঁপাতে ফোঁপাতে, রান্নাঘর থেকে সে ছুটে বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে আবার সে প্রলাপের মতো বকে উঠল, 'ভন্ড ! ভন্ড !'

বেশ কিছু সময়, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে টেবিলের চার ব্যক্তি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। আস্তে মা এবং কাকীমা উঠে গেলে, বাবা কবিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাগানের কথাবার্তা ও কি কিছু শুনে ফেলেছে ?'

'বাদ দাও তো !' দ্বিতীয়জন অস্থিরভাবে চেয়ার নাড়িয়ে, বিরক্তিতে ছুঁড়ে মারল কথাগুলো।

মা ফিরে এল।

দুজনার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে কাঁধটা সামান্য ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল, 'ও কাঁদছে !'

# আমরা ছাব্বিশজন ও একটি মেয়ে

আমরা ছাব্বিশজন লোক, ছাব্বিশটা জীবন্ত মেশিন—একটা বিরাট বাড়ির মাটির তলার নোংরা, অন্ধকার কুঠুরির মধ্যে আবদ্ধ থাকি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ময়দা ডলা, মচমচে নিমকি-বিস্কুট ও নোনতা বিস্কুট বানানো আমাদের কাজ। নীচের তলার জানালা দিয়ে ইট-গাঁথা নোংরা কুঠুরিটা দেখা যায়—দেয়ালটা চটচটে সবুজ হয়ে গেছে। কুঠুরির জানালাগুলোয় ঘন করে শিক বসানো, আর তার কাচ ভেদ করে সূর্যের আলো কখনই আমাদের এই ঘরে ঢুকতে পারে না—কাচগুলোতে অস্বচ্ছ কিছু একটা মাখানো। মালিক জানালাগুলো এমনভাবে ঘিরে দিয়েছে যাতে ঘর থেকে বিস্কুট কোন ভিখিরি বা ভবঘুরে, আমাদের বেকার কোন বন্ধুর হাতে গিয়ে না পেঁছতে পারে। মালিক আমাদের ডাকে একদল জোচ্চোর বলে, আর রাতের খাবার হিসেবে বরাদ্দ মাংসের নামে নোংরা নাড়িভুঁড়ি।

কালি-ঝুল ও মাকড়সার জালে ভরা নীচু ছাদের নীচে এই আবদ্ধ কারাকক্ষটির ভেতরে জীবন আমাদের অতিষ্ঠ। নোংরা দাগ ও শ্যাওলা ভরা ঐ পুরু দেয়ালের মধ্যে বেঁচে থাকা বড়ই কষ্টকর, ক্লান্তিময়। ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠতে হয়। যথেষ্ট ঘুম না হওয়ায় তখনও মাথা ভারী হয়ে থাকে। এবং ছটার সময় নিষ্প্রাণ জড় পদার্থের মতো আমরা টেবিলে বসে মাখা-ময়দা থেকে মচমচে নিমকি-বিস্কুট ও সস্তা বিস্কুট বানাতে শুরু করে দেই। আমরা যখন ঘুমোই আমাদের কিছু সহকর্মী তখন ময়দা মেখে রাখে। ভোর থেকে রাত দশটা, এই সুদীর্ঘ সময় ধরে আমাদের কেউ কেউ টেবিলে বসে শক্ত ময়দার ডেলা থেকে বিস্কুট বানায় আর দুলে দুলে শরীরের জড়তা কাটায়। অন্যেরা ময়দা ও জল মেশায়। নিমকি-বিস্কুটের ময়দা সেদ্ধ-করা-গামলা থেকে সারাদিন ফুটন্ত জলের সোঁ সোঁ শব্দ ওঠে—শব্দটা কেমন অদ্ভুত বিষন্ন। বিস্কুট যে ভাজে সে বেলচা করে সেদ্ধ পিচ্ছিল ময়দার টুকরোগুলো ক্রুদ্ধ ও দ্রুতবেগে গরম ইটের মধ্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয়, ফলে ঠুংঠাং শব্দ ওঠে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চুল্লীতে কাঠ জ্বলে।

আগুনের লাল আভা যেন নীরব বিদ্রূপে ঘরের দেওয়ালে ঠিকরে পড়ে। বিশাল চুল্লীটাকে মনে হয় কোন অদ্ভুত দৈত্যর মাথা মাটি ফুঁড়ে উঠেছে। তার হা-করা মুখের মধ্যে জ্বলছে লকলকে আগুন। আমাদের দিকে তপ্ত নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে সে তার কপালের উপর দুটো বাতাস নেবার গর্ত থেকে আমাদের এই বিরামহীন পরিশ্রম দেখে। ঐ গর্তদুটোকে দেখে মনে হয়—সেই দৈত্যের নির্দয় নির্বিকার দুটো চোখ। ঐ চোখ দুটো আমাদের মত গোলামদের অশুভ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে ক্লান্ত। এই গোলামগুলোর কাছে মানবিক কোন কিছুই আশা করা যায় না। ঐ চোখদুটো যেন অধিকতর জ্ঞানের নির্বিকার অবজ্ঞা নিয়ে আমাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে।

এই উত্তপ্ত শ্বাসরোধকারী ঘরে ময়দার গুঁড়ো ও রাস্তা থেকে পায়ে পায়ে বয়ে আনা কালিঝুলির মধ্যে আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ময়দা ডলি ও নিমকি-বিস্কুট বানাই। নিমকি-বিস্কুটে আমাদের শরীরের ঘাম ঝরে পড়ে। আমরা আমাদের এই কাজকে ভীষণ ঘৃণা করি। নিজহাতে যা বানাই, তা কখনও খাই না। এর চেয়ে পোড়া ঘাসের রুটিও ভাল লাগে। একটা লম্বা টেবিলের দু পাশে ন'জন করে মুখোমুখি বসে ঘন্টার পর ঘন্টা অত্যন্ত যান্ত্রিকভাবে আমরা হাত ও আঙ্গুলের কাজ করে যাই। এত অভ্যাস হয়ে গেছে যে কে কি করছি সেদিকে আর কেউ লক্ষ্য করি না। আর একে অপরকে এত ভালভাবে চিনে ফেলেছি যে প্রত্যেকেই সহকর্মীদের মুখের প্রতিটি ভাঁজ পর্যন্ত জানি। কথা বলার মতো আমাদের আর কোন বিষয় নেই, তাই সারাক্ষণ নীরব থাকি। আমরা এতেই অভ্যস্ত। শুধু মাঝে মাঝে অভিশাপ দিই—কারণ সব সময়ই কোন লোককে, বিশেষ করে নিজের বন্ধুকে অভিশাপ দেবার কিছু না কিছু থাকেই। অবশ্য আমরা একে অপরকে খুব একটা অভিশাপ দিই না। কেউ অর্ধমৃত হয়ে গেলে, পাথরের মূর্তির মত জড়পদার্থে পরিণত হলে, হাড়ভাঙ্গা খাটুনির চাপে কারো অনুভূতিসমূহ ভোঁতা হয়ে গেলে তাকে কি দোষারোপ করা যায়? যাদের সব কথা শেষ, নীরবতা তাদেরই কাছে বেদনাদায়ক, ক্লান্তিকর; কিন্তু যাদের কথা এখনও অনুক্ত রয়ে গেছে, তাদের কাছে নীরবতা স্বাভাবিক ও সহজ।

মধ্যেমধ্যে আমরা গান গাই, কিন্তু সেই গান আসে এইভাবে : কাজ করতে করতে কেউ হয়ত হঠাৎ ক্লান্ত ঘোড়ার মত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তারপর গুনগুন করে একটা দীর্ঘ টানা সুরে গান গাইতে আরম্ভ করে : সে গানের বিষাদপূর্ণ কোমল সুর গায়কের হৃদয়ের ভারী বোঝা হাল্কা করে দেয়। কোন একজন গান গায়, আর বাকীরা নীরবে নিঃসঙ্গ গানটি শোনে। এবং শরতের ভেজা রাতে, উন্মুক্ত প্রান্তরে, প্রজ্জলিত আগুনের শিখা যেমন পৃথিবীর উপরে সীসার ছাদের মতো ছেয়ে থাকা ধূসর আকাশের নীচে ধীরে ধীরে নিভে আসে, তেমনি সেই গান এই পীড়াদায়ক অন্ধ প্রকোষ্টের ছাদের নীচে ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যায়। তারপর আর একজন গায়ক প্রথম সুরের সাথে সুর মেলায় এবং দুটো কণ্ঠস্বর এই ঘিঞ্জি ঘরে শ্বাসরোধকারী উত্তাপের মধ্যে মধুর কোমলভাবে ভেসে বেড়ায়। তারপর হঠাৎ বেশ কয়েকটা কণ্ঠস্বর তার সাথে যোগ দেয়—সেই গান যেন তরঙ্গের মতো আছড়ে পড়ে এবং বলিষ্ঠ ও তীব্রতর হয়ে মনে হয় আমাদের এই কারাগারের স্যাঁতসেতে ভারী দেয়ালগুলো ভেঙে চুরমার করে দেবে।

তারপর ছাব্বিশজনই গাইতে শুরু করে; বহুদিনের অভ্যাসে গড়ে ওঠা ঐক্যতানে উচ্চ কণ্ঠস্বরগুলো সমস্ত কারখানাটা ভরে দেয়; এ গান মুক্তির বেদনা প্রকাশ করে; পাথরের দেয়ালে মাথা ঠোকে, গোঙায়, কাঁদে এবং হৃদয়ের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ব্যথার মোচড় আনে, পুরনো ক্ষতগুলোকে প্রকাশ করে এবং বুকের ভেতরে ক্রোধের জন্ম দেয়। গায়কেরা গভীর দীর্ঘশ্বাস নেয়; কোন একজন হঠাৎ থেমে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বন্ধুদের গান শোনে, তারপর আবার সেই সাধারণ যৌথসংগীতে গলা মিলিয়ে দেয়। অন্য কোন একজন চোখ বুজে গান গাইতে গাইতে হতাশার সুরে চিৎকার করে বলে ওঠে, "আ!" হয়ত বা, সে শব্দের এই প্রশস্ত তুফানকেই মনে করে দূরগামী কোন পথ, সূর্যের আলোয় ঝলমল করা কোন উন্মুক্ত পথ, যে পথ দিয়ে সে হেঁটে চলেছে…।

চুল্লীর মুখে আগুনের শিখা তখনও নেচে যায়। যে বিস্কুট ভাজছে তার বেলচা তখনও ইটের উপর শব্দ করে, ডেকচিতে জল তখনও টগবগ করে ফুটে চলে, দেয়ালের গায়ে লাল আগুনের আভা তখনও নীরব হাসিতে

কাঁপতে থাকে। আর যে-গানের বাণী আমাদের সৃষ্টি নয়, সেই গানের কথার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের ভেতরকার ভোঁতা বেদনা, সূর্যের আলো থেকে বঞ্চিত জীবন্ত মানুষের যন্ত্রণাময় বেদনা, গোলামের বেদনাকে প্রকাশ করি। আর এইভাবেই আমরা বেঁচে আছি, আমরা ছাব্বিশজন লোক একটা বিশাল পাথরের বাড়ির মাটির তলার এক অন্ধকারাচ্ছন্ন বন্ধঘরে বেঁচে আছি, এবং এখানে জীবনের বোঝা এত ভারী, মনে হয় এই বাড়ির তিনটি তলা যেন আমাদেরই কাঁধের উপরে গড়ে উঠেছে।

গান ছাড়াও একটা জিনিস আছে যাকে আমরা ভালবাসি ও যাকে নিয়ে আনন্দ করি। এমন একটা কিছু যা সম্ভবতঃ আমাদের না-পাওয়া সূর্যালোকের স্থান পূরণ করে। আমাদের বাড়িটার দোতালায় একটা জরী-এমব্রয়ডারীর কারখানা আছে। অনেক মেয়ে কাজ করে সেখানে, আর তাদের ফাইফরমাস খাটে ষোল বছরের একটি মেয়ে তানিয়া। প্রতিদিন সকালে আমাদের কারখানার দরজার ছোট্ট জানালার কাচের উপর একটি খুশী-উজ্জ্বল নীল চোখের গোলাপী মুখ এসে লাগে এবং মিষ্টি রিণরিণে কণ্ঠস্বর আমাদের ডেকে বলে ঃ

'ওগো জেলঘুঘুরা! কই কিছু নিমকি-বিস্কুট দাও!'

আমরা সকলে সেই উচ্ছল কণ্ঠস্বরে সচকিত হই এবং সেই নিষ্পাপ শিশুসুলভ মুখের দিকে কোমল ও খুশির ভঙ্গিতে তাকাই—আঃ আমাদের দিকে কি মিষ্টি হাসি ছড়ায় ঐ মুখ! আমরা কাচে-চেপ্টে-থাকা নাক, এবং হাস্যময় গোলাপী ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা ছোট ছোট চকচকে সাদা দাঁতগুলো দেখতে বড় ভালবাসি। পরস্পরকে ধাকাধাক্কি করে আমরা দরজা খুলতে ছুটে যাই, সে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। কি প্রাণবন্ত ও স্নিগ্ধ। এ্যাপ্রনটাকে দুহাতে তুলে ধ'রে, ঘাড়টাকে সামান্য কাত ক'রে উজ্জ্বল মুখে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে সে। তার বাদামী চুলের একটা মোটা বেণী কাঁধের উপর দিয়ে বুকের পরে ঝুলছে। মেঝে থেকে চৌকাঠ চার ধাপ উপরে—কালিঝুলি মাখা, শুকনো, কুৎসিত আমরা মাথা উঁচু করে তাকে দেখি ও সুপ্রভাত জানাই। তাকে স্বাগত জানানোর ভাষা একটি বিশেষ ভাষা, কেবল তারই জন্য আমরা এই ভাষা বেছে নিয়েছি।

তার সাথে কথা বলার সময় আমাদের স্বর কোমল হয়ে যায়, ঠাট্টা হয় হাল্কা মেজাজের। তার জন্য আমাদের সব কিছুই যেন বিশেষ ধরনের। যে বিস্কুট ভাজে সে চুল্লী থেকে এক বেলচা মচমচে ভাজা লাল বিস্কুট বার করে খুব দক্ষতার সঙ্গে তানিয়ার এ্যাপ্রনের উপর ঢেলে দেয়।

'দেখো, মালিক যেন দেখতে না পায়!' আমরা সাবধান করে দিই। সে খিলখিল করে হেসে খুশীতে চিৎকার করে বলে ওঠে:

'চলি গো জেলখুঘুরা।' তারপর খুদে ইঁদুরের মতো চোখের নিমেষে উধাও হয়ে যায়।

ব্যাস, ঐ টুকুই···। কিন্তু সে চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ ধরে আমরা তাকে নিয়ে আলোচনা করি—কাল যা বলেছি এবং পরশু যা বলেছিলাম সেই একই কথা আলোচনা করি, কারণ সে, আমরা এবং আমাদের পারিপার্শ্বিক সবই কাল যেমন ছিল, পরশু যেমন ছিল, ঠিক তেমনই আছে। চারপাশের কোন কিছুরই পরিবর্তন না ঘটলে বেঁচে থাকাটা খুবই বেদনাদায়ক ও কঠিন হয়ে পড়ে। যদি এর ফলে তার আত্মার মৃত্যু না ঘটে, তবে যত বেশী দিন সে বেঁচে থাকে, চতুপার্শ্বের জিনিসগুলোর অপরিবর্তন তত বেশী বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। আমরা সবসময় মেয়েদের নিয়ে এমনভাবে আলোচনা করি যে মাঝে মাঝে আমরা নিজেদের উপরেই, নিজেদের স্থূল নির্লজ্জ কথাবার্তার উপরেই বিরক্ত হয়ে উঠি। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ যেসব মেয়েদের আমরা চিনি তাদের নিয়ে মার্জিত রুচিতে কথা বলার কোন মানেই হয় না। কিন্তু তানিয়াকে নিয়ে কখনও স্থূল আলোচনা করি নি। আমাদের মধ্যে কেউ তাকে স্পর্শ করার কথা ভাবেনা এবং সেও কখনো আমাদের কাছ থেকে কোন স্থূল ইয়ার্কি শোনে নি। সম্ভবতঃ তার কারণ হচ্ছে, সে কখনও বেশী সময়ের জন্য থাকেনি—আকাশ থেকে তারা খসে পড়ার মতো আমাদের দৃষ্টিপটে ধরা পড়েই উধাও হয়ে যায়। অথবা তার কারণ এও হতে পারে যে সে খুব ছোট্ট ও সুন্দর। এবং যা সুন্দর তা মানুষের, এমনকি লম্পট ও স্থূলরুচির মানুষেরও শ্রদ্ধা জাগ্রত করে। যদিও নিরলস একঘেঁয়ে খাটুনী আমাদের বোবা ষাঁড়ে পরিণত করেছে, কিন্তু আমরা এখনও মানুষ।

আর বলটা মানুষের মতো আমরাও কোন আরাধ্য বস্তু ছাড়া বাঁচতে পারি না। সেই বাড়িতে এক ভজনের মতো ভাড়াটে থাকা সত্ত্বেও, মাটির তলায় অন্ধকারাচ্ছন্ন এই বন্ধঘরে অবস্থানকারী মানুষগুলোর চারপাশে তানিয়ার চেয়ে বেশী সুন্দর আর কিছু নেই, আর কেউ আমাদের দিকে তাকায়ও না। সর্বোপরি, সম্ভবতঃ এটাই মূল কারণ যে আমরা মনে করি সে আমাদেরই। তার অস্তিত্ব বেঁচে আছে আমাদেরই তৈরী বিস্কুটের উপরে। তাকে গরম বিস্কুট দেওয়াটা আমরা নিজেদের কর্তব্য করে নিয়েছি। সেই দেবী প্রতিমার কাছে এটা আমাদের দৈনিক অর্ঘ্য, প্রায় একটা পবিত্র ধর্মাচার। ফলে সেও প্রত্যহ বেশী বেশী করে আমাদের আপন হয়ে গেছে। গরম বিস্কুট ছাড়াও আমরা তানিয়াকে অনেক রকম উপদেশ দেই—সে যেন গরম জামা-কাপড় পরে, সিঁড়ি বেয়ে খুব ছুটে না ওঠে, খুব ভারী জ্বালানী কাঠের বোঝা না নেয়। সে হাসতে হাসতে আমাদের উপদেশ শোনে, হাসি মুখেই প্রত্যুত্তর দেয়, আর কখনও সেই উপদেশ মানে না। কিন্তু আমরা সে জন্য রাগ করি না—তার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছি এতেই আমরা তৃপ্ত।

প্রায়ই সে আমাদেরকে তার কাজ করে দিতে বলে। যেমন, সে যখন একটা অদ্ভুত গর্বভরে আমাদের কোন গুদামের দরজা খুলে দিতে বা কাঠ কেটে দিতে বলে, আমরা সানন্দে সেই কাজ করে দিই।

কিন্তু আমাদের কেউ যখন তার সবে-ধন-নীলমণি জামাটির কোন অংশ সেলাই করে দেবার জন্য অনুরোধ করল, সে ঘৃণায় নাক সিঁটকে বলে, 'আহা কি কথা! ও বাবা আমি পারব না!'

আমরা ঐ বোকা বন্ধুটাকে নিয়ে খুব হাসাহাসি করলাম এবং আর কখনও তাকে কোন কাজ করার কথা বলি না। আমরা তাকে ভালবাসি, আর এটাই একমাত্র কথা। মানুষ সব সময়ই তার ভালবাসার পাত্র খুঁজে বেড়ায়, যদিও তা প্রায়শই অত্যাচারে পরিণত হয়, তার জীবন নোংরা ও বিষাক্ত করে তোলে, কারণ ভালবাসার সময়ে মানুষ তার ভালবাসার পাত্রকে শ্রদ্ধা করে না। তানিয়াকে আমাদের ভালবাসতেই হবে। ও ছাড়া ভালবাসার মতো আমাদের আর কেউ নেই।

কখন সখনও আমাদের মধ্যে কেউ তর্ক জুড়ে দেয়, 'এ রকম একটা

ছোট্ট খুকিকে নিয়ে আদেখলাপনা করায় মানে কি ? ওর মধ্যে কি এমন আশ্চর্য জিনিস আছে শুনি ?'

এরকম কথা যে বলে তাকে আমরা কঠোর ভাষায় থামিয়ে দিই—আমাদের অবশ্যই ভালবাসবার মতো কিছু একটা থাকতে হবে ; আমরা তা পেয়েছি, তাকে ভালও বেসেছি, এবং আমরা ছাব্বিশজন যা ভালবেসেছি তা আমাদের প্রত্যেকের, সবচেয়ে পবিত্র জিনিস। যে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে সে আমাদের শত্রু। আমরা যা ভালবেসেছি হয়ত তা ভাল না হতে পারে, কিন্তু যেহেতু আমরা ছাব্বিশজনই এর সাথে জড়িত, আমরা চাই অন্যেরাও আমাদের প্রিয় বস্তুটিকে পবিত্র করে রাখবে।

আমাদের ভালবাসা ঘৃণার চেয়ে কম কষ্টদায়ক নয়···এবং সম্ভবতঃ সেই কারণেই কিছু গোঁয়ার লোক দাবি করে বলে যে ভালবাসার চেয়ে আমাদের ঘৃণা বেশী চাটুকারিতাপূর্ণ। তাই যদি হবে তবে তারা আমাদের এড়িয়ে চলে না কেন ?

বিস্কুট ছাড়াও মালিকের একটা বানরুটির কারখানা আছে। সেটা এই বাড়িতেই এবং একটিমাত্র দেয়াল সেটাকে আমাদের এই ঘিঞ্জিঘর থেকে পৃথক করে রেখেছে। অবশ্য বানরুটির কারিগরেরা সংখ্যায় মাত্র চারজন হলেও, নিজেদেরকে আমাদের থেকে পৃথক করে রাখে। মনে করে তারা আমাদের চেয়ে পরিষ্কার কাজ করে এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত জীব ; তারা কখনও আমাদের কারখানায় আসে না এবং যদি উঠোনে তাদের কারো সংগে আমাদের হঠাৎ দেখা হয়ে যায়, তারা বিদ্রূপসূচক ঘৃণা প্রকাশ করে। আমরাও তাদের কারখানায় যাই না—মালিক এই ভয়ে আমাদের ওখানে যাওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছে পাছে আমরা বানরুটি চুরি করি। বানরুটির কারিগরদের আমরাও ঘৃণা করি, কারণ আমরা ওদের প্রতি ঈর্ষান্বিত। আমাদের চেয়ে ওদের কাজ হাল্কা, ওরা বেশী মাইনা পায়, ভাল খাবার পায়, ওদের কারখানা বেশ খোলামেলা—হাওয়া খেলে, এবং ওরা সকলেই বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যবান। সেই কারণেই তারা এত বেশী ঘৃণ্য। অপর দিকে আমরা সকলেই পাণ্ডুর প্যাঁচামুখো, আমাদের মধ্যে তিনজনের সিফিলিস রোগ আছে, কারো কারো চুলকানি, একজন'ত বাতে বিকলাঙ্গ। ছুটির দিন বা রবিবারে তারা স্যুট ও

মচমচে উঁচু বুট জুতো পরে, তাদের দুজনের এ্যাকর্ডিয়ান আছে, এবং তারা সকলে মিলে পার্কে বেড়াতে যায়। আর আমরা নোংরা ছেঁড়া জামাকাপড় পরি, পায়ে থাকে ছেঁড়া কোঁচকানো জুতো, আর পুলিশও আমাদের পার্কে ঢুকতে দেয় না—সুতরাং আমরা কি ঐ সব বানরুটির কারিগরদের পছন্দ করতে পারি ?

একদিন শুনলাম যে ওদের প্রধান কারিগর মদ খেয়ে মাতলামি করেছে এবং মালিক তাকে খুব গালাগাল করে বদলে অন্য একজন লোক নিয়োগ করেছে। সেই নতুন কারিগরটা আগে সৈনিক ছিল। সে স্যাটিনের ওয়েস্ট-কোট পরে এবং তার সোনার চেনের একটা ঘড়ি আছে। সেই ফুলবাবুটিকে দেখবার জন্য আমরা খুব উৎসুক হয়ে গেলাম। তাকে দেখবার আশায় একের পর এক ঘন ঘন উঠানে ঘোরাফেরা করতে লাগলাম।

কিন্তু সে নিজেই আমাদের কারখানায় চলে এল। লাথি দিয়ে দরজা খুলে দরজার গোড়ায় দাঁড়াল, হেসে সম্ভাষণ করল : 'কি খবর! খোকনরা সব কেমন চলছে ?'

ধুমায়িত মেঘের মত মিহি তুষার-বাতাস দরজা দিয়ে ঢুকে তার পায়ের কাছে কুণ্ডলি পাকাতে লাগল, আর সে নীচে আমাদের দিকে তাকিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। গর্বোদ্ধত গোঁফের তলা থেকে তার বড় বড় হলদে দাঁত চকচক করতে লাগল। তার ওয়েস্টকোটটা সত্যিই চমৎকার—নীল, তার উপরে এমব্রয়ডারী করা ফুলগুলো চকচক করছে এবং বোতামগুলো এক ধরনের লাল পাথরের তৈরী। চেনটাও আছে।

সৈনিকটা সত্যিই খুব সুন্দর দেখতে—লম্বা, গাট্টাগোট্টা চেহারা, গালটা লাল টকটকে এবং বেশ বড় হালকা রংয়ের চোখজোড়ায় দৃষ্টিও খুব সুন্দর—বেশ স্নেহভরা, স্বচ্ছ দৃষ্টি। মাথায় আছে কড়া-মাড়-দেওয়া সাদা টুপি, এবং টানটান এ্যাপ্রনের তলা থেকে অত্যন্ত চকচকে কেতাদুরস্ত জুতোর ছুঁচলো মাথা উঁকি মারছে।

আমাদের প্রধান কারিগর তাকে মোলায়েম ভদ্রতায় দরজাটা বন্ধ করতে বলল। অত্যন্ত ধীরে দরজাটা বন্ধ করে সে মালিক সম্পর্কে আমাদের প্রশ্ন করতে লাগল। আমরা একজনের কথার উপরে আর একজন বলতে লাগলাম

যে, মালিকটি হচ্ছে একটা হাড়-কিপটে, খচ্চর, বদমাশ এবং অত্যাচারী—মালিক সম্পর্কে আমরা যা যা বললাম তা সব সম্ভবতঃ এখানে লেখা যায় না। গোঁফে তা দিয়ে পরিষ্কার মার্জিত দৃষ্টি দিয়ে আমাদের সম্মান দেখিয়ে সৈনিকটা সব শুনতে লাগল।

'তোমাদের এখানে অনেক মেয়ে আছে দেখছি', হঠাৎ সে বলে উঠল।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ভদ্রভাবে হেসে উঠল, অন্যেরা প্রসন্ন মুখ করে চেয়ে রইল এবং কোন একজন তাকে জানিয়ে দিল যে এখানে অনেক ডপ্‌কা তুলতুলে সুন্দরী আছে।

'ভোগ-টোগ চলে?' সৈন্যটা চোখ মেরে স্পষ্ট ইঙ্গিতে পাল্টা প্রশ্ন করে।

আবার আমরা হেসে উঠলাম, এবার একটু নরম করে, বিব্রত ভঙ্গীতে, আমাদের মধ্যে অনেকেরই সৈনিকটির মনে এই বিশ্বাস অর্জন করানোর ইচ্ছে হল যে, তার মত আমরাও খোস মেজাজী, কিন্তু তারা তা করতে পারল না। আমাদের মধ্যে কেউ তা করল না। কেউ একজন ধীরে এইটুকু শুধু বলল,

'ওরা আমাদের জন্য নয়…।'

সৈন্যটি আমাদের দিকে চোখ কুঁচকে বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সাথে বলল, 'নাঃ। তোমরা দেখছি অনেক পেছনে পড়ে আছ। কোন কাজের লোক নও…। খাঁটি চরিত্র বলতে কিছু নেই…। আসল জিনিসটা কি জানো? আসল জিনিস হচ্ছে চোখের চাউনী। মেয়েছেলেরা পুরুষের চোখের চাউনীকে সবচেয়ে বেশী পছন্দ করে। মোটামুটি শরীর দেখাও… দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। আর হ্যাঁ, অবশ্য সে কিছুটা ছাঁচা শরীর পছন্দ করে। আর পছন্দ করে ডানার মত ডানা—এরকম!'

সৈন্যটা পেকেটে গোঁজা ডান হাতটা বার ক'রে কনুই অবধি হাতাটা গুটিয়ে নেয়, এবং আমাদের দেখবার জন্য পেশী তুলে ধরে। হাতটা শক্ত ও সাদা, চকচকে সোনালী চুলে ভরা।

'পা, বুক, সমস্ত কিছুই শক্ত থাকতে হবে। বুঝলে হে, তারপর তোমার পোষাক, সেটাও ঠিক ঠিক থাকা চাই—একেবার ফিট্‌ফাট্। এই ধর আমারই কথা—মেয়েরী হুমড়ি খেয়ে আমার উপর এসে পড়ে। তা বলে ভেবোনা,

আমি তাদের পেছনে ছুটি বা তাদের উস্‌কানি দিই—তারা এমনই এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরে—এক একবারে পাঁচজন ক'রে।'

একটা ময়দার বস্তার উপরে বসে সবিস্তারে বলে, মেয়েরা তাকে কেমন করে ভালবাসে, তাদেরকে নিয়ে সে কি তৎপরতার সাথে চলে। তারপর তার প্রস্থান ঘটে। সশব্দে দরজা বন্ধ হয়ে গেলে আমরা দীর্ঘ সময় ধরে নীরবে বসে থাকি। তার কথা ও কাহিনীর কথা ভাবি। তারপর হঠাৎই সবাই একসাথে কথা বলতে শুরু করে দেই। আলোচনায় প্রকাশ পায় যে আমাদের সকলেরই তাকে খুব ভাল লেগে গেছে। কি সুন্দর, সরল একটা লোক, সে কিভাবে ভেতরে এল, বসল এবং গল্প করল, এইসব নিয়ে আমরা আলোচনা করি। এর আগে কখনও কেউ আমাদের সাথে দেখা করতে আসে নি, কেউ আমাদের সাথে এরকম বন্ধুর মতো কথা বলে নি। আমরা নতুন কারিগরটিকে জড়িয়ে সেই দরজি মেয়েগুলো সম্পর্কে আলোচনা শুরু করে দিলাম যারা উঠোনে হয় মুখ ভেংচে দূরে চলে যায়, না হয় আমাদের উপস্থিতিকেই উপেক্ষা করে সোজা হাঁটা লাগায়। আমাদের বিশ্বাস ভবিষ্যতে এ লোকটা ওসব দজ্জালদের জয় করবে। যখন সেইসব মেয়েরা শীতকালে পশমের কোট ও সুন্দর ছোট্ট টুপি পরে, এবং গরমকালে ফুলতোলা টুপি ও উজ্জ্বল রংয়ের ছাতা মাথায় দিয়ে উঠোনে, আমাদের জানালার পাশ দিয়ে যেত আমরা তাদের কেবল প্রশংসাই করতাম। অবশ্য তাদের নিয়ে আমাদের মধ্যে এমনসব আলোচনা করতাম, কানে গেলে ওরা লজ্জা ও ঘৃণায় পাগল হয়ে যেত।

'আশা করি সে কখনও আমাদের তানিয়ার দিকে যাবে না।' আমাদের প্রধান কারিগর হঠাৎ উদ্বেগের সুরে কথাটা বলে ফেলল।

এই কথায় আমরা সবাই হতবাক হয়ে গেলাম। তানিয়ার কথা ভুলেই গেছিলাম—সৈনিকটা যেন তার বিশাল সুন্দর চেহারা নিয়ে আমাদের মন থেকে তানিয়ার কথাটা মুছে ফেলেছিল। আমাদের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেল। কেউ কেউ বলল যে তানিয়াকে সে কিছুতেই টলাতে পারবে না, কেউ কেউ বলল তানিয়া সৈনিকটার আকর্ষণ ঠেকাতে পারবে না, এবং অন্যরা প্রস্তাব করল ব্যাটা যদি তানিয়ার দিকে এগোতে চায়, মেরে ওর

হাতছাড়া করে দেওয়া হবে। অবশেষে সকলে ঠিক করল যে সৈন্যটা ও তানিয়ার উপর নজর রাখা হবে, এবং মেয়েটিকে ওর সম্পর্কে সাবধান করে দেওয়া হবে। ওখানেই তর্কাতর্কির অবসান হ'ল।

প্রায় একমাস কেটে গেল। সৈনিকটা রুটি সেঁকে, দরজি মেয়েদের সাথে বাইরে যায়, প্রায়ই আমাদের সাথে দেখা করতে ঘরে আসে, কিন্তু কখনই তার অধিকার সম্পর্কে কোন কথা বলে না—কেবল গোঁফ পাকায় ও ঠোঁট চাটে।

তানিয়া প্রতি সকালে বিস্কুট নিতে আসে এবং আগের মতোই সে আনন্দোচ্ছল, মিষ্টি ও ভদ্র। আমরা তার সাথে সৈন্যটার ব্যাপারে কথা বলতে চেষ্টা করি—সে লোকটাকে 'ড্যাবা চোখের পুতুল' এবং অন্যান্য অদ্ভুত বিশেষণ দেয়, এবং আমরা খুশিই হই। দরজি মেয়েগুলো সৈন্যটার সাথে আঠার মতো লেগে থাকায় আমরা আমাদের ছোট্ট মেয়েটির জন্য গর্ব বোধ করি। লোকটার প্রতি তানিয়ার বিরূপ মনোভাব আমাদের খুব উৎফুল্ল করে তোলে, তারই প্রভাবে আমরা সৈন্যটাকে ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করি। আমরা তানিয়াকে আগের চেয়েও বেশী ভালবাসতে শুরু করি এবং প্রতি সকালে তাকে বেশী বেশী আনন্দোচ্ছ্বাস ও দরদ দিয়ে সম্বর্ধনা জানাই।

যাহোক, একদিন সৈন্যটা মাতাল হয়ে টলতে টলতে আমাদের সাথে দেখা করতে এল। বসে পড়ে হাসতে শুরু করল। যখন জিজ্ঞেস করলাম হাসছে কেন, সে বলতে আরম্ভ করল :

'লিডা ও গ্রুশা আমাকে নিয়ে মারামারি করেছে। নিজেরাই নিজেদের সাথে চুলাচুলি করেছে। ওঃ সে কি হিংসাহিংসি! হাঃ হাঃ! একজন আর একজনের চুলের মুঠি ধরে মাটিতে টানতে টানতে ঐ গলিটার ভেতর নিয়ে গিয়ে বুকে চেপে বসেছে। হাঃ—হাঃ—হাঃ! একজন আর একজনের মুখ আঁচড়ে জামা ছিঁড়ে ফেলেছে। আমি কি হাসলাম! এই সব জেনানি মাগীগুলো সরাসরি লড়াই করতে পারে না কেন? ওরা আঁচড়ায় কেন, অ্যা?'

সে বেঞ্চের উপর বসে—তাকে কি পরিষ্কার, স্বাস্থ্যবান ও হাসিখুশী

দেখাচ্ছে—কি বিরামহীন হাসছে! আমরা কিছু বললাম না। যে কারণেই হোক এখন তাকে দেখে আমাদের ঘৃণা হচ্ছে।

'মেয়েছেলের বিষয়ে আমার ভাগ্য এত ভাল কেন বলতো? সত্যিকারের হিংসাহিংসানি! কেন। আমি একবার শুধু চোখ মারব আর কেল্লা ফতে!'

চকচকে লোমশ সাদা হাতটা সে উপরে তুলল এবং নামিয়ে হাঁটুর উপরে চাপড় মারল। সে আমাদের দিকে একটা খুশীভরা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকাল, যেন মহিলাদের ব্যাপারে নিজের সৌভাগ্যে সত্যিকারের বিস্ময় বোধ করছে। একটি নির্মল আনন্দে তার গোলগাল লাল মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আর ঠোঁটের উপর জিভ বোলাতে লাগল।

আমাদের প্রধান কারিগর ক্রুদ্ধভাবে বেলচাটা চুল্লীর ভেতর ঢুকিয়ে, হঠাৎ ব্যাঙ্গের স্বরে বলে উঠল:

'নিছক ফার গাছ ফেলায় কোন মজা নেই—পাইন গাছ নিয়ে কি কর দেখতে ইচ্ছে করে!' •

'কি, কি বললে? আমায় কিছু বলছ?' সৈন্যটা প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমাকে।'

'তুমি কি বলছ কি?'

'কিছু মনে করো না···। যা বলেছি থাক।'

'এই দাঁড়াও দাঁড়াও। তুমি কি নিয়ে বলছ বলতো? পাইন গাছ বলতে কি বোঝায়?'

আমাদের কারিগর উত্তর দিল না। তার বেলচা সেঁধ করা বিস্কুটগুলো কড়াইয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল এবং ভাজা বিস্কুটগুলো মেঝেয় ফেলে দিল। সেখানে ছেলেরা সুতোয় গাঁথছে। সে যেন সৈন্যটার কথা ভুলে গেছে। কিন্তু সৈন্যটা হঠাৎ ক্ষেপে উঠল। দাঁড়িয়ে কড়াইয়ের কাছে গেল, বেলচার হাতলটা উঁচুতে লাফিয়ে উঠে একটু হলেই তার বুকে আঘাত করত।

'শোন,—কি বলতে চাও? এটা রীতিমত অপমান। কেননা, এখানে এমন কোন মেয়ে নেই যে আমার হাত ফসকাতে পারে। না, দাদা এমন কেউ নেই! আর তুমি কিনা আমার সাথে মস্করা করছ?'

মনে হল সে সত্যিই আহত হয়েছে। এ কথা ঠিক তার আত্মসম্মানের মূল উৎসই হচ্ছে মেয়ে শিকারের ক্ষমতা; সম্ভবতঃ এই একটিমাত্র মানবিক গুণে নিয়েই সে অহংকার করতে পারে, এবং এই একটিমাত্র জিনিসের জন্যই সে মনে করে সে একজন পুরুষ।

এমন লোক আছে যাদের কাছে জীবনের আসল বিষয়ই হচ্ছে দেহ বা মনের বিকৃতি। এ সবই তাদের জীবনকে ঘিরে রাখে, এর জন্যই তারা বেঁচে থাকে। এই বিকৃতির জন্য কষ্ট ভোগ করলেও এর দ্বারাই তারা নিজেদের তৃপ্তি সাধন করে। লোককে তারা এ বিষয়ে নালিশ জানায়, এ ভাবেই তাদের সহগামীদের চিত্তাকর্ষণ করে, লোকের কাছ থেকে সহানুভূতির মাশুল আদায় করে, আর জীবনে তাদের এই একটিমাত্র জিনিসই আছে। সেই বিকৃতি থেকে বঞ্চিত করলে, সুস্থ করে তুললে তাদের জীবন হয়ে উঠবে একান্তই দুর্বিষহ, কারণ জীবনের মূল উদ্দেশ্যটাই হারিয়ে তারা শূন্য খোলসে পরিণত হবে। কখনও কখনও মানুষের জীবন এতই হতভাগ্য হয়ে পড়ে যে পাপকর্মে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়, তাকে আঁকড়েই পড়ে থাকে। কেউ হয়ত বলবেন, মানুষ প্রচন্ড এক-ঘেঁয়েমির মধ্যে থেকেই পাপকর্মে আসক্ত হয়ে পড়ে।

সৈন্যটির যেন মর্মে হুল বিঁধেছে। সে আমাদের কারিগরের সামনে গিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করে বলতে লাগল:

'না, তুমি বল—কে সে?'

'বলব, বলছ?' কারিগর হঠাৎ তার দিকে ঘুরে বলল।

'হ্যা!'

'তুমি তানিয়াকে চেন?'

'আচ্ছা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ তার কথাই বলছি! ওকে কি করতে পার দেখব।'

'আমি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি।'

'ওকে? অতি সহজে, তুড়ি মেরে!'

'আমরা দেখতে চাই!'

'দেখতে চাও! হাঃ হাঃ!'

'কেন, সে তো—'

'এক মাসও সময় লাগবে না!'

'তোমার খুব দম্ভ, তাই না সৈনিক?'

'ঠিক আছে, তবে পনেরো দিন! আমি তোমাদের দেখাব! কার কথা বললে? তানিয়া? ফুঃ!'

'ঠিক আছে, তুমি যাও। লেগে পড়!'

'মাত্র পনেরো দিন, তারপরই দেখবে কাজ ফতে! বুঝলে হে!'

'বেরিয়ে যাও!'

কারিগর হঠাৎ রেগে উঠে তার বেলচাটা উঁচিয়ে ধরল। সৈন্যটা বিস্ময়ে পিছিয়ে এল, তারপর নীরবে কিছুক্ষণ আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁত কড়মড়িয়ে বলে উঠল, 'ঠিক আছে!' তারপর বেরিয়ে গেল।

গভীর আগ্রহে, নীরবে এই লড়াইটা শুনছিলাম। কিন্তু সৈনিকটি চলে যেতেই আমরা সবাই চিৎকার করে উত্তেজিত বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়লাম।

কে যেন একজন কারিগরকে চিৎকার করে বলে উঠল:

'প্যাভেল, তুমি একটা বাজে জিনিসের সূত্রপাত ঘটালে!'

'নিজের কাজ কর!' কারিগর ধমক দিয়ে উঠল।

আমরা বুঝতে পারলাম যে সৈন্যটির অহংকারে ঘা লেগেছে এবং তানিয়া বিপদে পড়বে। এবং এটা জানা থাকা সত্ত্বেও আমরা সকলেই কি হয় জানবার একটা তীব্র আনন্দদায়ক কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে পড়লাম। তানিয়া কি সৈন্যটির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে? আমরা প্রায় বিনা প্রতিবাদে এই প্রত্যয় উচ্চারণ করলাম:

'তানিয়া? অবশ্যই জিতবে! সে অত সস্তা নয়, তাকে নিয়ে খেলা অত সোজা নয়।'

আমাদের আরাধ্য দেবীকে এই পরীক্ষায় নামাবার জন্য ভয়ঙ্কর উৎকীর্ণ হয়ে উঠলাম। পরস্পরকে আপ্রাণ বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে আমাদের দেবীমূর্তি অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং সে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেই। উল্টে, আমরা এও আলোচনা করতে লাগলাম যে আমরা সৈন্যটিকে যথেষ্ট তাতাতে

পেরেছি কি না—কারণ আমাদের ভয় হল যে সে হয়ত এই বাজির কথা ভুলে যাবে, তাই তার আত্ম-অহঙ্কারে আরও কিছু খোঁচা লাগাতে হবে। এখন থেকে একটা নতুন উত্তেজক উৎসাহ আমাদের জীবনে যুক্ত হল, এ এমন একটা জিনিস যার স্বাদ আমরা আগে কখনই পাই নি। বেশ কয়েকদিন ধরে আমরা নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি করলাম ; আমরা সবাই কিভাবে যেন বেশ চালাক হয়ে উঠেছি, ভাল ভাল কথা বেশী বেশী করে বলতে লাগলাম। আমরা যেন শয়তানের সাথে একটা খেলায় মেতেছি, আমাদের লড়ায়ের সম্বল হচ্ছে তানিয়া। যখন বান রুটির কারিগরের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে তাদের সৈনিকটি 'তানিয়ার জন্য মরণযাত্রা শুরু করেছে', আমাদের উত্তেজনা চরম সীমায় উঠে গেল। উত্তেজনাময় অভিজ্ঞতায় জীবন এমন ভরপুর হয়ে উঠল যে লক্ষ্যই করলাম না কোন ফাঁকে মালিক এই সুযোগে আমাদের দিয়ে প্রতিদিন অতিরিক্ত চোদ্দ দলা ময়দার কাজ করিয়ে নিচ্ছে। আমাদের কাজে আর ক্লান্তিও আসছে না। সারাদিনই মুখে তানিয়ার নাম ধরে বেড়ায়। একটা অদ্ভুত অধৈর্য নিয়ে আমরা সকালে তার আসার অপেক্ষায় থাকি। মাঝে মাঝে মনে হয় কোন একদিন আমাদের কাছে এলে দেখব যে এক অন্য তানিয়া এসেছে, এ যেন সেই তানিয়া নয় যাকে আমরা সব সময় জানতাম।

অবশ্য, আমরা ঐ বাজি সম্পর্কে তাকে কিছু বলিনি।

তাকে কখনও কোন প্রশ্ন করি নি বরং একই স্নেহভরা ভাল ব্যবহার করেছি। কিন্তু আমাদের মনোভাবের মধ্যে যেন নতুন কিছু একটা প্রবেশ করেছে, যা তানিয়া সম্পর্কে আমাদের পূর্বের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক—আর নতুন উপাদানটি হচ্ছে অদম্য কৌতুহল, এমন কৌতুহল যা ইস্পাতের ফলার মতো তীক্ষ্ম ও শীতল।

'খোকারা! আজ শেষ দিন!' কোন এক সকালে কারিগর কাজ শুরু করে বলল।

মনে না করিয়ে দিলেও আমরা খুব ভালভাবেই তা জানতাম। তবুও সবাই চমকে উঠলাম।

'তোমরা তানিয়াকে লক্ষ্য রেখো। ও এখুনি ভেতরে আসবে,' কারিগর

পরামর্শ ছিল। কে যেন অনুতাপের সাথে বলে উঠল :

'এ জিনিস চোখে দেখে বোঝা যায় না।'

এবং আবার একটা হৈচৈ তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেল। আজকে, অবশেষে আমরা জানতে পারব যে-পাত্রে আমরা আমাদের অন্তরের সর্বোৎকৃষ্ট বস্তুটি বিশ্বাস করে রেখেছি সেটা কতখানি পবিত্র, নিষ্কলুষ। এই প্রথম একটি সকাল আমাদের সামনে আসছে যখন আমরা সর্বোচ্চ পণ দিয়ে জুয়ো খেলছি, যখন আরাধ্য দেবীমূর্তির পরীক্ষা আমাদের ভরাডুবি ঘটাতে পারে। এতদিন শুনে আসছি যে সৈনিকটি তানিয়াকে কাছে টানবার প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে, কিন্তু যেকোন কারণেই হোক আমরা কেউ তানিয়াকে তার সম্বন্ধে প্রশ্ন করি নি। সে বরাবরের মতোই প্রতি সকালে আমাদের কাছে বিস্কুট নিতে এসেছে এবং সব সময়েই নিজের মতোই ছিল।

সে দিনও আমরা তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম :

'কিগো, জেল ঘুঘুরা। আমি এসেছি···।'

তাড়াতাড়ি তাকে ভেতরে ঢুকতে দিলাম এবং যখন সে ভেতরে এল, বিপরীত পদ্ধতিতে তাকে স্বাগত জানালাম—সেটা হল নীরবতা। আমরা তার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালাম এবং বুঝতে পারলাম না কি বলব, কি জিজ্ঞেস করব। তার সামনে দাঁড়িয়ে একদল নির্বাক, গোমরামুখো লোক। এই অস্বাভাবিক সম্বর্ধনা পেয়ে সে অবশ্যই অবাক হয়ে গেল, এবং হঠাৎ দেখলাম সে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, তাকে অস্থির দেখাচ্ছে। ধরা গলায় সে প্রশ্ন করল :

'তোমরা সবাই আজ এত···অদ্ভুত কেন ?'

'তোমার খবর কি ?' কারিগর তার মুখের উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

'আমার আবার কি খবর ?'

'না কিছু না।'

'ঠিক আছে, বিস্কুট দাও, জলদি।'

আগে কখনও সে তাড়া দেখায় নি!

'অনেক সময় আছে,' কারিগর স্থির দৃষ্টিতে উত্তর দিল।

হঠাৎই সে ঘুরে দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

কারিগর তার বেলচা তুলে নিয়ে চুল্লীর দিকে ঘুরে শান্তভাবে বলল :

'হ্যাঁ, সে ধরা দিয়েছে! সৈন্যটা, শয়তানটা জয় করেছে।'

আমরা ভেড়ার পালের মত পরস্পরকে গুঁতো মারতে মারতে টলতে টলতে টেবিলে ফিরে গিয়ে বসে পড়লাম এবং নীরবে উদাসভাবে কাজ শুরু করে দিলাম। কোন একজন তখন বলে উঠল :

'সে ধরা নাও দিতে ...।'

'চুপ কর! অনেক হয়েছে!' কারিগর চিৎকার করে উঠল।

সবাই জানি সে বুদ্ধিমান, আমাদের সকলের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান। তার চিৎকারই আমাদের বলে দিল যে সৈনিকের বিজয় সম্পর্কে সে নিশ্চিত। আমরা বিষণ্ণ ও হতবিহ্বল বোধ করতে লাগলাম।

বারোটার সময়—মধ্যাহ্নভোজের সময়—সৈনিকটি ভেতরে এল। সে বরাবরের মতোই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ফিটফাট, এবং আগের মতোই সোজাসুজি আমাদের মুখের দিকে তাকাল। তার দিকে তাকাতে আমরা খুবই অস্বস্তি বোধ করছি।

'কিগো, মহাশয়েরা, দেখতে চাও একজন সৈনিক কি করতে পারে? সবাই ঐ সরু পথটায় গিয়ে দাঁড়াও, দেয়ালের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারো। বুঝলে আমার কথা?' সে গর্বভরে কথা কটা বলল।

আমরা দল বেঁধে সরু পথটায় গিয়ে দাঁড়ালাম। একে অপরের উপরে ঠাসাঠাসি কাঠের দেয়ালের একটা ফাঁকের মধ্যে আমাদের মুখগুলো চেপে ধরে উঠোনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। দেখলাম তানিয়া দ্রুত পায়ে, উদ্বিগ্ন দৃষ্টি নিয়ে গলা বরফ ও কাদা-ভরা গর্তের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠোনটা পার হয়ে গুদাম ঘরের দরজার ভেতরে ঢুকে মিলিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে সৈনিকটিও শিস দিয়ে অলসভাবে ঘোরাঘুরি করতে করতে সেখানে ঢুকে গেল। হাত দুটো তার পকেটে ঢোকান আর গোঁফজোড়া নাচছে।

বৃষ্টি পড়ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি গর্তটায় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে বুদবুদ উঠছে। দিনটা ভেজা ধূসর, অত্যন্ত বিষণ্ণ। ছাদে এখনও তুষার

পড়ে আছে, মাটিটা থকথকে কাদায় ভরা। ছাদের ওপরের বরফও খয়েরী রংয়ের ধুলোয় ধূসোরিত। এই পথটায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা খুব অস্বাস্থ্যকর এবং ঠান্ডাও খুব বেশী।

ঐ গুদোম ঘর থেকে প্রথমে বেরিয়ে এল সৈনিকটি। পকেটে দুটো হাত ঢুকিয়ে, গোঁফ নাচাতে নাচাতে, সে তার অভ্যেস মতোই অলসভাবে উঠোনটা পার হয়ে গেল।

তারপর বেরিয়ে এল তানিয়া। তার চোখজোড়া···তার চোখজোড়া আনন্দ ও খুশীতে উজ্জ্বল, আর ঠোঁটে রয়েছে হাসি। আর সে যেন স্বপ্নের ভেতর দিয়ে হেঁটে চলেছে, অসংলগ্ন পা ফেলে, দুলে দুলে···।

আমাদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। হঠাৎ সবাই ধাক্কাধাক্কি করে দরজা দিয়ে উঠোনে বেরিয়ে এলাম এবং ভয়ংকর, সুউচ্চ, আদিম গর্জনের মতো আমরা তার দিকে চিৎকার করে উঠলাম, শিস দিতে শুরু করলাম।

আমাদের দেখেই সে চমকে উঠল এবং স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। একটা নোংরা গর্তে তার পা পড়েছে। তাকে ঘিরে ধরে নোংরা ও অশ্লীল বিদ্রূপ বর্ষণ করে আমরা এক ধরনের বীভৎস উল্লাসে তাকে অভিশাপ দিতে লাগলাম।

যখন দেখলাম ব্যূহ করে তার পক্ষে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব, আর মনের ইচ্ছেয় বিদ্রূপ করা যাবে, তখন কোন তাড়াহুড়ো না করে, নীচু গলায় আমরা এসব করতে লাগলাম। খুবই আশ্চর্যের বিষয়, আমরা ওকে আঘাত করলাম না। সে আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, এপাশ ওপাশ মাথা ঘুরিয়ে সমস্ত অপমান শুনছে, এবং আমরা আরও বেশী জোরে ও ক্রুদ্ধভাবে আমাদের ক্রোধের বিষ ও বিষ্ঠা তার দিকে ছুঁড়ে দিতে লাগলাম।

তার মুখ প্রাণহীন, ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সেই নীল চোখজোড়া, একটু আগেও যা খুশীতে ভরপুর ছিল, ঘোলাটে হয়ে গেল। সে হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়তে লাগল, তার ঠোঁট কাঁপতে শুরু করল।

এবং আমরা তাকে চারিদিক থেকে বেষ্টন করে তার প্রতি আমাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে লাগলাম—কারণ, সে কি আমাদের নিঃস্ব করে দেয় নি ? সে ছিল আমাদের। তার জন্যই হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অনুভূতিগুলো

হারিয়েছি, এবং যদিও সেইসব শ্রেষ্ঠ অনুভূতি নিতান্তই একটি ভিক্ষুকের সম্পদ, কিন্তু আমরা ছাব্বিশজন আর সে একা এবং তার অপরাধের সমতুল্য কোন বেদনাই আমরা প্রকাশ করতে পারলাম না। আমরা কি ভাবেই না তাকে অপমান করলাম! সে একটি কথাও বলল না, কিন্তু প্রচন্ড ভয়ে তার সারা শরীর কাঁপতে লাগল এবং সে শুধু আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমরা হো হো করে হাসলাম, হুংকার দিলাম, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠলাম। অন্যান্য লোকেরাও এসে পড়ল। আমাদের একজন তানিয়ার ব্লাউজের হাতা ধরে টানল।

হঠাৎ তার চোখ জ্বলে উঠল। সে ধীরে হাত তুলে চুল ঠিক করল এবং স্থির উচ্চস্বরে আমাদের মুখের উপর বলে উঠল:

'ওঃ, যত সব জঘন্য জেলঘুঘু!'

যেন আমরা সেখানে নেই, তার পথে দাঁড়িয়ে নেই, ঠিক এইভাবে সে সোজা আমাদের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে গেল। বস্তুত মনে হল, ঠিকই যেন আমাদের কেউই তার পথে দাঁড়িয়ে নেই। বেষ্টনী থেকে যখন সে পুরোপুরি বেরিয়ে গেছে, আমাদের দিকে না তাকিয়ে ঘৃণা ও গর্ব মিশ্রিত স্বরে একই রকম চিৎকার করে সে বলে উঠল:

'যত সব নোংরা, শুয়োরের দল। জন্তুর দল।' এবং সে চলে গেল—সোজা, সুন্দর ও গর্বিত।

উঠোনে কাদার মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম, মাথার উপরে বৃষ্টি পড়ছে এবং ধূসর আকাশে সূর্যের দেখা নেই।

তারপর আমরাও আবার আমাদের স্যাঁতসেঁতে কুঠুরির কারাগারে ফিরে গেলাম। আগের মতোই, সূর্য কখনও আমাদের জানলা দিয়ে উঁকি মারে না। এবং তানিয়াও আর কখনো এখানে আসে না।

# কোলুম্বা

রোদবৃষ্টিতে জীর্ণ, আগাছার জঙ্গলে ঢাকা কবরখানার এই দুঃখের পূতবার অংশে, বার্চগাছের চিকন ছায়ায় এক অর্ধ-বয়স্কা নারী নিঃসঙ্গ বসেছিল। পরনে তার ছাপ-ছোপ পোষাক এবং গা-মাথা ঢাকা একটি কালো ছেঁড়া শাল। অগোছালো কাঁচা-পাকা চুলের গোছা তোবড়ান গালের একপাশে ছড়িয়ে পড়েছে; ঠোঁটজোড়া কঠিন এবং ঈষৎ ঝুলে-পড়া। কি এক শোকজর্জর হাহাকারে মৌন। চোখের পাতা ফোলা এবং ভারী—গোপন অশ্রু এবং বিনিদ্র রজনী যাপনের চিহ্ন।

একটু দূরে আমার নিঃশব্দ দাঁড়িয়ে থাকার প্রতি তার কোনে ভ্রূক্ষেপই ছিল না এমনকি আমি আরও কাছাকাছি এলে সে কেবল একবার অনুজ্জ্বল চোখজোড়া তুলে ঈষৎ দৃষ্টিপাত করেই আবার নত হয়ে রইল—আমার প্রতি কোন কৌতূহল, অসন্তোষ বা এ জাতীয় কোন অনুভূতি দেখা গেল না।

ভদ্রতার খাতিরে একটু অভ্যর্থনা জানিয়ে আমার প্রথম আলাপ শুরু হল এবং জিজ্ঞেস করলাম, সামনের ছোট্ট কবরটুকুতে কে শুয়ে আছে।

'আমার ছেলে'—সে উদাস গলায় উত্তর করল।

'বয়স্ক ?'

'বার বছর বয়স'

'কবে মারা গেছে ?'

'চার বছর আগে।'

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে তালিমারা শালের কিছুটা অংশ পিঠ থেকে সরিয়ে নিল। খুব গরম পড়েছে; জ্বলন্ত সূর্য নির্মমভাবে আগুন ছড়াচ্ছে নির্জন এই মৃত-ভূমিতে। কবরের ঘাস ধুলো ও তাপে বিবর্ণ হয়ে গেছে; ঊর্ধমুখী ক্রুশগুলোর পাশে পাশে অবিন্যস্ত গাছগুলো যেন নিষ্পন্দ প্রাণহীন। বালকটির কবরের দিকে ঝুঁকে আমি প্রশ্ন করলাম, 'এইটুকু বয়সেই কি করে মরল ?'

'ঘোড়ার খুরে দলে-পিষে গেছল'—সংক্ষিপ্ত উত্তরের পরই সে কাঁপা—

কাঁপা শুষ্ক হাতখানা বাড়িয়ে কবরের ঢিপিটা স্পর্শ করল।

'ঘোড়ার খুরে ?···কেমন করে হল ?'

বুঝলাম কৌতূহলে সৌজন্যবোধের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছি কিন্তু মহিলার অদ্ভুত নিস্পৃহতায় মরিয়া হয়েই কুটিল, অনির্বচনীয় মনের খেয়ালে আমি ওর অশ্রুজল দেখতে চাইলাম। তার এই নিস্পৃহতায় একটু বিশেষত্ব ছিল তাই আমার প্রশ্নে তার কোন পরিবর্তন ঘটল না। কেবল মুখ তুলে নিঃশব্দে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে, উদাস গলায় তার কাহিনী শুরু করল। কাহিনী শুরুর আগে আমি আবার তার ভারী নিঃশ্বাস শুনতে পেলাম।

"এভাবেই মরেছিল। অর্থ আত্মসাৎ-এর অপরাধে ওর বাবার যখন দেড় বছর জেল হল, আমরা আমাদের খুদ-কুড়ো পুঁজিটুকু খেয়ে নিঃশেষ করে ফেললাম। অনন্যোপায় হয়ে, অবশেষে, কাঠ, শিকড়-বাকল জ্বালানীর জন্য বিক্রী শুরু হয়ে গেল। আমার এক পরিচিত মালী একগাড়ী পচা জ্বালানী দিয়েছিল, আমি তা গোবর মেখে শুকিয়ে বিক্রী করতাম কিন্তু সেগুলো থেকে প্রচুর ধোঁয়া বেরোত এবং রান্না থেকেও উঠত সে গন্ধ। কোল্‌যা যেত পাঠশালায়। খুব ছটফটে এবং হিসেবী। সে বুঝতে আমার দুঃখের কথা। বাড়ী ফেরার পথে সামান্য কাঠ-কুটোটি পেলেও সযত্নে সে বাড়ী নিয়ে আসত।

তখন বসন্তকাল, বরফ গলতে শুরু করছে। সামান্য একটা ফেল্ট-বুট ছাড়া ওর কিছু ছিল না। বাড়ী ফিরে যখন জুতো ছাড়ত, পাতাজোড়া ঠান্ডায় লাল হয়ে যেত।

সেই অবস্থায় একদিন গাড়ীতে করে ওর বাবাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেল জেল কর্তৃপক্ষ। কারণ যক্ষ্মারোগে ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়েছে সে। ছেঁড়া বিছানায় শুয়ে সে আমার দিকে ক্রূর, দুর্বোধ্য হাসিতে তাকিয়ে থাকল; আমিও ওর দিকে এমন একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করতাম ভাবখানা যেন, 'তোর জন্য আমাদের এই নির্যাতন, কি করে এখন আমি সামান্য খুদ-কুড়ো যোগাড় করি! কাদাজলে ডুবে মর, আমার হাড় জুড়োয়।' কিন্তু কোল্‌যা ওর বাপকে দেখেই আঁতকে উঠল; ভয়ে তার মুখটা ফ্যাকাশে, চোখের জল ফেলে বলল, 'বাবার কি হয়েছে, মা ?' বললাম, 'ওর দিন ফুরিয়ে গেছে।' তারপর

থেকেই আমাদের অবস্থার আরও অবনতি ঘটতে লাগল।

খেটে খেটে আমার দেহ ক্ষয়ে যেতে লাগল, তবুও দৈনিক—বরাৎ ভাল থাকলেও—কুড়ি কোপেকের বেশী হাতে আসছিল না। এর চাইতে মরণ ভাল; আমি মাঝে মাঝে ভাবতাম দেহের জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়িয়ে দেই। কোল্‌যো আমার মনের কথা যেন শুনতে পেত আর বিমর্ষ গোমড়ামুখে বেরিয়ে যেত বাড়ী থেকে। যখন ভাবতাম আর পারছি না সহ্য করতে, চেঁচিয়ে উঠতাম, 'হায়! এই পশুর জীবন কি আমার ভাগ্যেই লেখা ছিল! ভগবান, মরণ হয় না কেন আমার!...তোরা, তোদের একটা মরলেও আমার হাড় জুরোয়!'—ইঙ্গিতটা ওর বাপ এবং কোল্‌যোর প্রতি। বুড়ো বাপ কথাগুলো শুনে মৃদু মৃদু মাথা দোলাত, যেন বলতে চাইছে, 'অভিশাপের দরকার নেই গো, দিন আমার এমনিতেই ঘনিয়ে এসেছে; একটু অপেক্ষা কর।' কোল্‌যো অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ী থেকে গেল বেরিয়ে। চলে যেতেই মন আমার ডেকে উঠল, 'কি কথা মুখে আনলাম!' কিন্তু তখন দেরী হয়ে গেছে, খুব দেরী। ঘন্টাখানেকও বোধহয় যায়নি, দরজার সামনে এসে পুলিশের ঘোড়ার গাড়ী থামল। 'এটা কি শিশোনিনার ঘর?' ভারী গলা শুনে ভেতরটা আমার ধক্ করে উঠল। মুখ বাড়াতেই হেঁকে উঠল, 'একবার হাসপাতালে যেতে হবে।...তোর ছেলে ব্যবসায়ী এ্যানোখিনের ঘোড়ার গাড়ীতে চাপা পড়েছে।' দ্রুত ছুটে গেলাম হাসপাতালে। যতক্ষণ গাড়ীর সিটে বসেছিলাম মনে হচ্ছিল শরীরে কে যেন রাশি রাশি জ্বলন্ত কয়লা ঢেলে দিচ্ছে। মনে মনে নিজেকে বলছি, 'হতভাগী, এ কি করলি তুই!'

ঢুকেই দেখি, সমস্ত শরীর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় একটা জীর্ণ খাটে কোল্‌যো পড়ে আছে। আমাকে দেখেই চোখ তুলে ম্লান হাসল, গাল বেয়ে নামল অশ্রুজল। বিড়বিড় করে উঠল সে, 'ক্ষমা কর আমাকে মা, ক্ষমা কর। পুলিশেরা আমার পয়সাগুলো কেড়ে নিয়েছে।' 'কোন্ পয়সার কথা বলছিস, কোল্‌যো?'

'আমাকে, আমাকে পথের লোক আর এ্যানোখিন যা দিয়েছিল।' আমি ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন, কেন তারা দিয়েছিল?'

'আমি…আমি…' শেষ করার আগেই সে যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল। চোখ দুটো তার বেরিয়ে আসতে চাইছে।

'কোল্যো, বাছা আমার! ঘোড়াগুলোকে আগ থেকে দেখতে পারলি না?' ধীরে ধীরে জবাব দিল, 'দেখেছিলাম, মা। কিন্তু পথ ছেড়ে উঠতে চাইনি আমি। ভাবলাম, আমার শরীরের ধার দিয়ে গেলে, পথের মানুষ হয়ত সহানুভূতিতে ক'টি বেশী কোপেক দেবে।…দিয়েওছিল।'

ব্যাপারটা আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠতেই কেঁদে উঠলাম, 'বাছা, এ তুই কি করতে গেলি!' কিন্তু চোখের জল ফেলারও আর অবসর ছিল না।

পরদিন সকালে সে মারা গেল। মৃত্যুর আগের মুহূর্তেও তার জ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পায়নি, অনর্গল বিড়বিড় করে গেছে, 'বাবা, এটা-ওটা কিনো। তোমার নিজের জন্য যা ভাল লাগে এ পয়সায় কিনো!' যেন সে প্রচুর অর্থ বাড়ীতে হাজির করেছে। আসলে ওর হাতের মুঠোয় ছিল মাত্র সাতচল্লিশটি কোপেক।

আমি ব্যবসায়ী এ্যানোখিনের কাছে হাজির হতে, গজগজ করে পাঁচটা রুবল আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'ছোঁড়া ইচ্ছে করেই'ত নিজেকে গাড়ীর তলায় গলিয়ে দিয়েছিল। রাস্তার সব্বাই দেখেছে। কিসের আশায় এসেছিস তাহলে?' আমি আর কোনদিন ও মুখো হইনি। এই, এই হল আমার বাছার জীবনের পরিণতি, শুনলে ত এবার।"

সে চুপ করে গেল এবং আগের মতই নিরুত্তাপ, উদাসীন হয়ে উঠল।

কবরখানাটি মৃত্যুর মতই নীরব, নিঃসঙ্গ। ক্রুশ, প্রাচীন বৃক্ষ, মাটির ঢিপি এবং সম্মুখে বসা উদাসীন মহিলাটির বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস,—মৃত্যু ও মানুষের দুঃখ-কষ্ট সম্বন্ধে আমাকে চিন্তিত করে তুলল। এদিকে মেঘশূন্য আকাশ থেকে আগুন ঝরছে মাটির বুকে।

পকেট থেকে কয়েকটি কোপেক তুলে, ভাগ্যের নির্মম হাতে নিগৃহীত হয়েও পৃথিবীতে বেঁচে থাকা এই নারীর সামনে তুলে ধরলাম। সে মৃদু মাথা নাড়িয়ে, ফিসফিস করে জবাব দিল, 'নিজের অভাবকে আর বাড়াচ্ছ কেন বাছা। আজকের জন্য ঘরে কিছু আছে আমার। বেশী'ত দরকার নেই আর।…আমি একা, পৃথিবীতে আমি এখন একা।'

গভীর নিঃশ্বাস ফেলে, শোকতপ্ত মুখে ঠোঁটজোড়াকে আবার সে কঠিন করে তুলল।

# পাঠক

তখন রাত হয়ে গেছে। আমি যে বাড়িতে কিছু ঘনিষ্ট লোকের কাছে আমার একটা সদ্য প্রকাশিত গল্প পড়ে শোনাচ্ছিলাম সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। তারা আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। আমি নির্জন রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছি—বেঁচে থাকার এ রকম আনন্দ আগে কখনও অনুভব করিনি।

ফেব্রুয়ারী মাসের পরিষ্কার রাত। আর মেঘমুক্ত তারকাখচিত আকাশ পৃথিবীতে ঝরে-পড়া তুষারের মনোরম রাজমুকুটের উপরে প্রাণজুড়ানো শীতল নিঃশ্বাস ফেলছে। রাস্তার ধারে বেড়ার উপর ঝুঁকে থাকা গাছের ঝোপ-ঝাড়ে আমার পথের উপরে আপন খেয়ালে ছায়ার আলপনা আঁকা এবং চাঁদের কোমল নীল আলোর আভায় তুষার কণাগুলো আনন্দে ঝিকমিক করে উঠছে। কোথাও কোন প্রাণের আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। কেবল আমার পায়ের নীচে বরফ গুঁড়ো হওয়ার শব্দ। এই একমাত্র শব্দ যা ভাবগম্ভীর, স্মরণীয় এই রাত্রির নীরবতাকে ভেঙে খানখান করে দিচ্ছে।

আমার মনে হল, হ্যাঁ এই পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠা, নিজের লোকজনের মাঝে বিশিষ্ট হয়ে ওঠা খুবই সুখকর।

এবং আমার কল্পনায় আমার ভবিষ্যত···এর চিত্র আঁকতে গিয়ে কোন উজ্জ্বল রংয়ের পোঁচই বাকি রইল না।

'সত্যি, আপনার ছোট্ট গল্পটা খুবই আনন্দদায়ক। আপনাকে স্বাগত জানাই', পেছন থেকে একটি ভাবগম্ভীর কন্ঠস্বর ভেসে এল।

চমকে ঘুরে তাকালাম।

পেছন থেকে, কালো পোষাকে ঢাকা একটা খুদে লোক কিছুটা এগিয়ে আমার পায়ে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে বুদ্ধিদীপ্ত হাসির অভ্যর্থনায় আমার মুখের দিকে তাকাল। লোকটার সবকিছুই ধারালো ঃ চোখের দৃষ্টি, গালের হাড়, সামান্য ঝুলে থাকা দাড়ি সম্বলিত থুতনি ; তার ফিট্‌ফাট্ চেহারার মধ্যে চোখধাঁধানো চমক রয়েছে। লোকটা এমন নিঃশব্দে চলছে, যেন

বরফের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। ঘরে শ্রোতাদের মধ্যে লোকটাকে দেখিনি, তাই এ গল্পের মন্তব্যে খুবই বিস্মিত হলাম। ও কে? কোত্থেকেই বা উদয় হল?

'আপনি কি…আপনিও কি ওখানে ছিলেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ, আমিও সেই আনন্দেরই অংশীদার।'

গায়কী ঢঙে সে কথাটা বলল। লোকটার ঠোঁটজোড়া পাতলা এবং ছোট কালো গোঁফজোড়া ঠোঁটের হাসিকে আড়াল করে না। তাই নিরবিচ্ছিন্ন হাসি অস্বস্তি সৃষ্টি করে। মনে হল এর মধ্যে এমন একটা ব্যঙ্গ লুকিয়ে আছে যা আমার কাছে আদৌ সুখকর হয়ে উঠবে না। কিন্তু মেজাজটা আমার এতই ভাল আছে যে এই নতুন সঙ্গীটির এ বিষয়টায় বেশী সময় নষ্ট করতে ইচ্ছে করছে না। আর নিজের আত্মতৃপ্তির উজ্জ্বল আলোয় এইসব ভাবনা ছায়ার মতো মুছে গেল। পাশে পাশে চলছি আর ভাবছি সে কি বলবে এবং মনে মনে আশা করছি ওর বলার মধ্যে সন্ধ্যায় অনুভূত সুখদায়ক মুহূর্তগুলো আরও ঘন হয়ে উঠবে। স্বভাবতই মানুষ লোভী, কারণ ভাগ্যদেবী সচরাচর তার উপর সদয় হাসি বর্ষণ করেন না।

'প্রত্যেকেই নিজেকে অন্যের চেয়ে বিশিষ্ট ভাবতে ভালবাসে, তাই না?' সঙ্গীটি প্রশ্ন করল।

এ মন্তব্যে আপত্তিকর কিছুই পেলাম না, তাড়াতাড়ি সায় দিলাম।

'টি—হি—হি!' খিক্‌খিক্ করে হেসে টানটান আঙুলগুলো নিয়ে সে তার ছোট্ট হাত দুটো এলোমেলো ঘসতে লাগল।

তার হাসির খোঁচা খেয়ে নীরস মন্তব্য করলাম, 'আপনি দেখছি খুব আমুদে লোক।'

মাথাটা হেলিয়ে, হেসে সে আমাকে সমর্থন করে বলল, 'হ্যাঁ, আমি আমুদে লোক। আবার আমার জানবার ইচ্ছাও খুব বেশী…। সব সময়ই—জানতে চাই—সব কিছুই জানতে চাই। আমার এই জানার ইচ্ছাটা চিরকালের। এই ইচ্ছার তাড়নায় সর্বদা চালিত হয়ে আসছি। এখন যা জানতে চাই সেটা হল—এই সাফল্যের জন্য আপনাকে জীবনে কি মূল্য দিতে হয়েছে?'

আমি তাকিয়ে নিস্পৃহভাবে উত্তর দিলাম :

'প্রায় এক মাস···বা একটু বেশীই হয়ত লেগেছে।'

সে চটপট উত্তর দিল, 'আঃ! অল্পস্বল্প পরিশ্রম, দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট অভিজ্ঞতার সব সময়ই কিছু মূল্য আছে···। তবুও আমি বলব, এই যে আপনি ভাবছেন যে এই মুহূর্তে কয়েক হাজার লোক আপনার চিন্তার অংশীদার হচ্ছে, লেখা পড়ছে,—তার তুলনায় এই মূল্য খুব একটা বেশী কিছু নয়। এবং এর পরেই আসে এই আকাঙ্ক্ষা যে সম্ভবতঃ, কালক্রমে··· হাঃ—হাঃ! আর যখন আপনি মরে যাবেন···হাঃ—হাঃ—হাঃ!···কারণ আপনার আরও বেশী কিছু দেবার ইচ্ছা জাগবে, আপনি আমাদের ইতিমধ্যে যা দিয়েছেন তার চেয়ে সামান্য কিছু বেশী। তাই নয় কি?'

সে তীক্ষ্ম কালো ধূর্ত চোখে আমাকে নিরীক্ষণ করে খিক্‌খিক্ বিদ্রুপের হাসিতে ফেটে পড়ল। আমিও তাকে নিরীক্ষণ করলাম এবং তারপর গম্ভীর, আহতস্বরে জিজ্ঞেস করলাম,

'মাফ করবেন ···। আমি কার সাথে কথা বলছি জানতে পারি কি?'

'আমি কে জানতে চাইছেন? বুঝতে পারছেন না? বেশ, তাহলে আপাততঃ বলছিনা আমি কে। কোন ব্যক্তির বক্তব্যের চেয়ে তার নাম জানাটাকে নিশ্চয়ই বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন না?'

'না, তা অবশ্য নয়···। তবুও ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত লাগছে,' আমি উত্তর দিলাম।

কেন জানি না সে আমার কোটের হাতাটা ধরে নীরবে মুচকী মুচকী হেসে বলল, 'বেশ তো, অদ্ভুত লাগুক না। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বাইরে, মাঝে-মাঝে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে যেকোন লোকের রাজী হওয়া উচিত। ···আর আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে আসুন আমরা মন খুলে কথা বলি! ধরুন, আমি একজন পাঠক—একজন অচেনা পাঠক। ধরুন, এমন একজন পাঠক যে খুব উৎসুক হয়ে জানতে চায় যে ঠিক কেন ও কিভাবে বই লেখা হয়—এই ধরুন, আপনার যে বইটা লেখা হল তার বিষয়ে আমরা কিছু আলোচনা করি।'

আমি বললাম, 'আরে, এতো খুবই আনন্দের কথা···রোজ তো আর

এরকম লোকের সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা বলার সুযোগ পায় না···।' কিন্তু মিথ্যা বললাম। আসলে পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে খুব খারাপ লাগছে। লোকটা চায় কি? একটা সম্পূর্ণ অজানা অচেনা লোকের সাথে এই মামুলী কথাবার্তাকে বিতর্কের মধ্যে দিয়ে যেতে দেব কেন?

একইভাবে আমি তার পাশাপাশি ধীর পদক্ষেপে হেঁটে চলেছি আর বিনয় মনোযোগের ভাব আনবার চেষ্টা করছি। এ ভাব আনতে খুব কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু যেহেতু আমার মেজাজ এখনও বেশ ভাল আছে, এবং যেহেতু তার সাথে কথা না বলে তাকে অপমানিত করতে চাই না, আমি নিজেকে সংযত রাখবারই মনস্থির করলাম।

চাঁদটা আমাদের পেছনে চলে গেছে। ফলে পথে পড়েছে আমাদের ছায়া, ছায়াযুগল মিলেমিশে কালো আঁধারের টুকরো হয়ে আগে আগে বরফের উপর দিয়ে হামাগুঁড়ি দিয়ে চলছে এবং সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, আমার ভেতরেও এমন একটা কিছু জন্মাতে শুরু করেছে যা এই ছায়ার মতোই অন্ধকারাচ্ছন্ন, মোহ সৃষ্টিকারী এবং আমার সামনে সামনে চলছে।

মিনিট খানেক আমার সঙ্গীটি চুপ থেকে এমন একজন আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন লোকের স্বরে কথা বলে উঠল যে আপন চিন্তাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

'মানব-প্রকৃতির গতিবিধির চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক জিনিস পৃথিবীতে আর কিছুই নেই···তাই নয় কি?'

আমি মাথা নাড়লাম।

'আপনি মানছেন!···তবে আসুন আমরা মন খুলে আলোচনা করি—এই যুবক বয়সে কখনও মন খুলে আলোচনা করার সুযোগ নষ্ট করবেন না!'

কি অদ্ভুত লোকরে বাবা, আমি ভাবি; হঠাৎ উৎসাহভরে বক্র হেসে প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু কি নিয়ে আলোচনা করব?'

লোকটা মুহূর্তের জন্য আমার দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকাল, তারপর অতি পরিচিত পুরোনো বন্ধুর মতো চেনাসুরে বিস্ময় প্রকাশ করে বলে উঠল, 'আমরা সাহিত্যের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করব!'

'ঠিক আছে, কিন্তু—বেশ রাত হয়ে গেছে না কি?'

খুব দেরী। না—আপনার কাছে এটা খুব বেশী রাত নয়।'

কথাকটা আমাকে থামিয়ে দিল। সে এমন আন্তরিক আশ্বাসের সুরে কথা-কটা বলল, যা এমন রূপকধর্মী যে আমি তাকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করার জন্য থেমে গেলাম। কিন্তু সে আমার হাত মৃদু আকর্ষণ করে আমাকে এগিয়ে নিতে লাগল।

'দাঁড়াবেন না। বেশ ভাল রাস্তা দিয়েই যাচ্ছি···। যাহোক, অনেক আলাপ পরিচয় হল! এখন বলুন, সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি?···আপনি সাহিত্য চর্চা করেন, সুতরাং আপনার এটা জানা উচিত।'

আমি ক্রমশঃ এত বিস্মিত হয়ে পড়ছি যে নিজেকে স্থির রাখতে পারছি না। কি চায় লোকটা আমার কাছে? কে ও?

আমি বললাম, 'হ্যাঁ শুনুন, আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে এই সমস্ত···।'

'একটা সত্যিকারের ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে করা হচ্ছে, বিশ্বাস করুন! ভাল উদ্দেশ্য ছাড়া এ পৃথিবীতে কোন কিছুই ঘটে না···। সুতরাং চলুন একটু জোরে পা চালাই, না না সামনে নয়, ভেতরের দিকে।'

এভাবে কথার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়াটা নিশ্চয়ই খুব মজার ব্যাপার, কিন্তু লোকটার কথায় আমি বিরক্ত হলাম। এগিয়ে যাবার জন্য পুনরায় অধৈর্য্য হয়ে উঠলাম। কিন্তু সে শান্তভাবে কথা বলতে বলতে আমার পিছু নিল।

'আমি বেশ বুঝতে পারছি। এই মুহূর্তে আপনার পক্ষে সাহিত্যের উদ্দেশ্যের কোন সংগা দেওয়া কঠিন। আমি নিজেই একটা সংগা দেওয়ার চেষ্টা করছি।'

সে একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে, হেসে আমার মুখের দিকে তাকাল।

'আপনি নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হবেন যদি আমি বলি, মানুষ যাতে নিজেকে বুঝতে পারে, যাতে তার নিজের উপর বিশ্বাস বাড়ে এবং যাতে তার সত্য সন্ধানের ইচ্ছা জাগ্রত হয়; যাতে তার নীচতা ও ক্ষুদ্রতা দূরে হয়, শুভবুদ্ধির উদয় হয়, তার মনে লজ্জা, ক্রোধ ও সাহসের অনুভূতি জাগ্রত হয়, সাহিত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে সে বিষয়ে মানুষকে সাহায্য করা। এমন কিছু করা যাতে সে মহানরূপে শক্ত ও সমর্থ হয়ে উঠে নিজের জীবনকে সুন্দরের

পরিবত উদ্দীপনায় ভরপুর করে তুলতে পারে। এ হ'ল আমার সংজ্ঞা ; অবশ্য এটা একটা মোটামুটি সংজ্ঞা হল···। জীবনকে অনুপ্রাণিত করার মতো যা কিছু আছে এর সাথে যোগ করে নেবেন। এখন বলুন—আপনি কি এই সংজ্ঞার সাথে একমত ?'

আমি বললাম, 'ঠিকই বলেছেন। প্রায় যথার্থই হয়েছে। সাধারণভাবে এটাই ধরে নেওয়া হয় যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব জাতিকে মহৎ করে তোলা।'

'তা হলে কি মহান কর্তব্যই না আপনি পালন করছেন।' লোকটা বেশ মিষ্টি করে কথাটা বলল—এবং আবার পরিচিত ব্যঙ্গের হাসি হাসল।

'কিন্তু এসব কথা বলছেন কেন ?' প্রশ্ন করলাম—ভাবখানা এমন যে তার হাসি যেন আমি গায়েই মাখিনি।

'ভাবছেন কেন ?'

কয়েকটি কড়া মন্তব্য মনে করার ব্যর্থ চেষ্টার পর বললাম, 'সত্যি কথা বলতে কি···।' সত্যি কথা বলা বলতে কি বোঝায় ? লোকটি বোকা নয়, সে নিশ্চয়ই জানে মানুষের এই সত্যি কথা বলার সীমানা কত ক্ষুদ্র এবং আত্ম-সম্মানের ঘেরাটোপে কি কঠিন গন্ডীতে বাঁধা। সঙ্গীটির দিকে তাকাতেই দেখি সে হাসছে ; আমি ভীষণ মর্মাহত হলাম —এই হাসিতে রয়েছে প্রচন্ড বিদ্রুপ ও ঘৃণা। আমার ভয় করতে শুরু করল ; এমন ভয় যে এখুনি পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।

'শুভরাত্রি', টুপিটা তুলে ধরে হঠাৎ বলে ফেললাম।

'কেন ?' লোকটা নম্রভাবে বিস্ময় প্রকাশ করল।

'এমন ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না যা শেষ পর্যন্ত মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।'

'ও, তাই আপনি চলে যাচ্ছেন ?···ভাল কথা, যা ইচ্ছা করুন। কিন্তু মনে রাখবেন যদি এখন চলে যান তবে আমাদের আর কখনই সাক্ষাৎ হবে না।'

লোকটি 'কখনই' শব্দটার উপর জোর দিল এবং কবরখানার ঘন্টার মতো তা আমার কানে বেজে উঠল। আমি এই শব্দটাকেই সর্বদা ভয় ও ঘৃণা করে এসেছি। এটা যেন মানুষের আশাকে নস্যাৎ করার জন্য বিধাতার

ঝিলিক, বিশাল হাতুড়ির মতো ভারী, শীতল একটা কিছু। এই শব্দটাই আমাকে থামিয়ে দিল।

'আপনি কি চান বলুন তো?' কষ্টে ও ঘৃণার সুরে আমি কথাটা জিজ্ঞেস করলাম।

সে ফের হেসে বলল, 'আসুন, বসি' এবং শক্ত থাবার হাতটা ধরে আমাকে টেনে বসাল।

এখন আমরা মিউনিসিপ্যালিটির বাগানে একটা রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছি—রাস্তার উপরে লোকাস্ট ও লিলাক গাছের বরফ-ঢাকা নিশ্চল ডালপালা ঝুলে রয়েছে। চাঁদের আলোর ঝিকমিকিয়ে ডালপালাগুলো আমার মাথার উপরে দুলছে এবং মনে হচ্ছে বরফ ও কুয়াশায় ঢাকা এই শক্ত ডালগুলো আমার বুক ভেদ করে হৃৎপিণ্ডের গভীরে আঘাত করছে।

সঙ্গীটির ব্যবহারে বিস্মিত ও হতবিহ্বল হয়ে নীরবে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ভাবলাম, লোকটার নিশ্চয়ই একটা কিছু গণ্ডগোল আছে—মানে লোকটার এই ব্যবহারের একটি সুবিধাজনক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করলাম আর কি। কিন্তু সে যেন আমার মনের কথা বুঝতে পারল।

'আপনি ভাবছেন আমি অপ্রকৃতিস্থ? ওসব কথা বাদ দিন। এটা খুবই সস্তা ও বাজে ধারণা! প্রায়ই আমরা এইসব কথা বলে কি ভাবেই না একজন মানুষকে বুঝতে অস্বীকার করি, অথচ সে হয়ত আমাদের চেয়েও বেশী মৌলিক চিন্তা করে। আর কি ভীষণভাবেই না এই ধারণা আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে এক দুঃখজনক কৃত্রিমতা চিরস্থায়ী করে ও বাড়িয়া তোলে!'

'হ্যাঁ, সত্যিই…', লোকটির উপস্থিতিতে আরও বেশী বেশী করে বিরক্ত বোধ করে আমি বলি। 'কিন্তু যদি অনুমতি দেন, মানে আমাকে যেতেই হবে…। আমার যাবার সময় হয়ে গেছে।'

সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে ওঠে, 'ঠিক আছে, যান। যান…তবে মনে রাখবেন এই তাড়াহুড়ো করে আপনি নিজের প্রকৃত স্বরূপটিই জব্দ করছেন।' সে আমার হাতটা ছেড়ে দিল, আমি হাঁটা লাগালাম।

জলাশয়ের তীরে কোন একটি পাহাড়ের উপরে পার্কের ভেতর তাকে রেখে চলে এলাম—তুষারে ঢাকা পাহাড়টার পায়ে-চলা-পথের কালো ফিতের আঁকিবুকি আঁকা। তার সামনে, নদীর ওপারে রয়েছে নিঃশব্দ বিরাট সমতলভূমির একটি বিস্তীর্ণ দৃশ্যপট। একটি বেঞ্চে বসে দূর দিগন্তের দিকে সে তাকিয়ে রইল, আর আমি পথ ধরে নীচের দিকে হাঁটতে লাগলাম। বেশ বুঝতে পারছি তার কাছ থেকে পালাতে পারব না, তবুও আমি হাঁটতে লাগলাম। লোকটা যে আমার মনে কোন রেখাপাতই করেনি এটা দেখানোর জন্য আমি কি জোরে হাঁটব, না আস্তে?

শুনতে পেলাম লোকটা শিষ দিয়ে একটা চেনা সুর ভাঁজতে শুরু করেছে···। গানটা সেই অন্ধ মানুষকে নিয়ে একটা ছোট্ট করুণ ও কৌতুক গান যে আর একটা অন্ধ মানুষকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কেন সে এই বিশেষ গানটা বেছে নিল ভাবছি।

আর তখনই অনুভব করলাম যে এই লোকটার সাথে সাক্ষাতের সময় থেকেই আমি একটা অদ্ভুত ও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত অনুভূতির অন্ধকার চক্রের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। আমার সাম্প্রতিক ভাবগম্ভীর, আত্মসুখী মানসিকতা এক ধরনের অশুভ অনুভূতির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে।

কি করে সে-পথ দেখাবে গো নেতা,
যে-পথের তুমি জাননা বারতা?

লোকটা শিষ দিয়ে যে গানটা ভাঁজছিল তার কথাগুলো আমার মনে পড়ে গেল।

আমি ঘুরে পেছনের দিকে তাকালাম। সে তার হাঁটুর উপরে কনুই ঠেকিয়ে তালুতে চিবুক রেখে আমাকে দেখছে আর শিষ দিচ্ছে। তার মুখের উপরে চাঁদের আলো পড়ায় চকচক করছে, আর নাচছে তার কালো গোঁফজোড়া। ভয়ঙ্কর কোন এক অশুভ পরিণতির আশঙ্কায় আমি ফিরে যাবার জন্য মনস্থির করলাম। ফিরে গিয়ে তার পাশে বসে শান্ত, আগ্রহভরে বললাম, 'ঠিক আছে, আসুন আমরা সরল মনেই কথা বলি···।'

সে মাথা নেড়ে বলল, 'আমাদের সকলেরই সরল হওয়া দরকার।'

'আমার ধারণা, আমাকে প্রভাবিত করার মতো ক্ষমতা আপনার আছে

এবং আমাকে বলার মতো আপনার নিশ্চয়ই কিছু কথাও আছে··· । তাই নয় কি ?'

'যাক, শেষ পর্যন্ত শোনবার মতো সাহসটুকু অর্জন করলেন !' সে সহাস্যে বিস্ময় প্রকাশ করল । কিন্তু এখন তার হাসিটা আগের চেয়ে অন্য এবং এই হাসির মধ্যে আনন্দের ছোট ছোট ঢেউ-এর মতো কিছু একটা আছে বলে মনে হল ।

আমি বললাম, 'বেশ ভাল কথা, এবার বলুন ! আর আপনার ঐ অদ্ভুত ভাবভঙ্গীগুলো বাদ দিয়ে যদি আপনি··· ।'

'খুব ভাল কথা ! কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই মানবেন, ঐ অদ্ভুত ভাব-ভঙ্গীগুলো আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যই প্রয়োজন ছিল । যা কিছু স্পষ্ট ও সাধারণ, সেগুলোর প্রতি আমাদের আগ্রহকে ভোঁতা করে দিয়েছে এই আধুনিক জীবন ; এ জীবন আমাদের কাছে খুবই কঠিন ও শীতল । আর কোন কিছু উষ্ণ ও নরম করার ক্ষমতাই আমরা হারিয়ে ফেলেছি, কারণ আমরা নিজেরাই যে শীতল ও শক্ত হয়ে পড়েছি । মনে হয়, আমাদের আবার ভৌতিক মায়াকল্প, উদ্ভট কল্পনা, স্বপ্ন ও অদ্ভুত সব জিনিসের প্রয়োজন । আমরা যে-জীবন গড়ে তুলেছি তার কোন রঙ নেই—একঘেঁয়ে ও নীরস ! আমরা যে এক সময় নতুন কিছু করবার জন্য এত ব্যগ্র ছিলাম এই সত্যই আমাদের ধ্বংস ও হত্যা করেছে··· । আমাদের কি করার আছে ? যাহোক, আসুন চেষ্টা করে দেখি । সম্ভবতঃ আবিষ্কার ও কল্পনার ক্ষমতা মানুষকে ক্ষণিকের জন্য এই পৃথিবী থেকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে এবং পুনরায় তার হৃতস্থান চিনে নিতে সাহায্য করবে । কারণ তা হারিয়ে গেছে, তাই নয় কি ? মানুষ আর এই পৃথিবীর প্রভু নয় । সে জীবনের ক্রীতদাসে পরিণত হয়ে গেছে ; সত্য ঘটনার কাছে মাথা নত করার তার প্রধান অবলম্বন সেই গর্বকেই হারিয়ে ফেলেছে । তাই নয় কি ? তার নিজেরই সৃষ্ট ঘটনা থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে সে বলে যে এটা একটা দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম ! এবং নিয়মের প্রতি আনুগত্যের ফলেই যে সে স্বাধীন সৃজনশীলতার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, এ কথা সে বুঝতে অক্ষম । সে দেখেনা যে সৃষ্টির জন্য ধ্বংস করার অধিকারের সংগ্রামের ক্ষেত্রেও সে নিজেকে সংকুচিত করে ফেলেছে । এমন কি

সে এখন কোন সংগ্রামই করছে না, কেবল মানিয়ে চলছে··· । সংগ্রাম করার বিষয় তার আর কি আছে ? কোথায় সেই আদর্শ যার জন্য সে শৌর্য-বীর্যের প্রকাশ ঘটাবে ? সেই কারণেই জীবন এত ক্ষুদ্র ও ভোঁতা, সেই কারণেই মানুষের সৃজনশীল ক্ষমতা বাঁধা পড়ে গেছে··· । কেউ কেউ অন্ধভাবে সেই জিনিস পেতে চায় যা তার মনে ডানা লাগিয়ে দেবে এবং তার নিজের মধ্যে মানুষের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনবে । বেশীরভাগ সময়েই তারা সেখানে যায়না যেখানে রয়েছে শাশ্বত বিষয়সমূহ, যা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে, যেখানে ঈশ্বরের বাস··· । সত্যের সন্ধানে যারা পথ হারিয়ে ফেলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ! ধ্বংস হোক তারা, আমরা তাদের বাঁধা দেব না, বা তাদের প্রতি করুণাও প্রকাশ করব না—পৃথিবীতে আরও অনেক অনেক মানুষ আছে ! এখন প্রয়োজন উদ্দীপনার, ঈশ্বরকে পাবার কামনা, এবং ঈশ্বরকে পাবার কামনায় ভরপুর মানুষদের সাথেই তিনি থাকেন ও তাদের জীবনে পূর্ণতা এনে দেন । কারণ তিনিই হলেন পূর্ণতার জন্য শাশ্বত প্রচেষ্টার স্বরূপ··· । তাই নয় কি ?'

'হ্যাঁ, তাই,' আমি বললাম ।

'আপনি দেখছি খুব সহজেই একমত হয়ে যান ।'

সঙ্গীটি পুনরায় বিদ্রূপের হাসি হেসে কথাটা বলল, এবং তারপরই দূরে দৃষ্টি মেলে চুপ করে গেল । সে অনেকক্ষণ চুপ করে রয়েছে, এবং আমি অধৈর্যে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম । সুদূরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, আমার দিকে না তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ঈশ্বর কে ?'

এই প্রশ্নটার পূর্বমুহূর্তেও সে শান্ত ও নম্র স্বরে কথা বলছিল এবং তার কথা শুনেতেও বেশ ভাল লাগছিল ; সমস্ত চিন্তাশীল মনীষীর মতো এই লোকটিও কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ এবং এটাই তাকে আমার আরও কাছে টেনে এনেছে । মনে করছিলাম তাকে আমি বুঝতে পারছি এবং আমার বিরত ভাবটাও দূরে হতে শুরু করেছিল । হঠাৎ এই লোকটা এমন একটা কঠিন প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল যে আমাদের সংস্কার যে কোন মানুষের পক্ষে এর উত্তর দেওয়া খুব কঠিন—অবশ্য যদি সে নিজের কাছে সৎ হয় । আমার ঈশ্বর কে ? যদি আমি তাই জানতাম !

এই প্রশ্নের কাছে আমি পরাজিত হয়ে গেলাম। কেনই বা হবে না ? আমার মতো অবস্থায় পড়লে কার বুদ্ধি ঠিক থাকত ? সে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল, হাসল এবং আমার উত্তরের অপেক্ষায় রইল।

'উত্তর দিতে সক্ষম ও আগ্রহী লোকের তুলনায় আপনি অনেক বেশী সময় চুপ করে আছেন। মনে হচ্ছে, যদি প্রশ্নটাকে এইভাবে রাখি তবে হয়ত আপনি আমাকে কিছু উত্তর দিতে পারেন ; আপনি একজন লেখক, হাজার হাজার লোক আপনার লেখা পড়ে ; তাদের কি বানী দেন আপনি ? আর কখনও কি ভেবে দেখেছেন আপনার শিক্ষা দেবার কোন অধিকার আছে কি না ?'

এর আগে কখনও আমি মনের গভীরে চিন্তারাশির দিকে এত ঘনিষ্টভাবে তাকানোর জন্য পীড়িত হই নি। কেউ যেন মনে না করেন, মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যই আমি বিনয় প্রকাশ করছি বা নিজেকে অপমান করছি— ভিক্ষুকের কাছে ভিক্ষা চাইবার কোন অর্থ হয় না। আমি নিজের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ সদয় অনুভূতি ও কামনা, যথেষ্ট পরিমাণে, যাকে চলতি কথায় বলে, মঙ্গল-এর সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু আমার মধ্যে সে অনুভূতি খুঁজে পাইনি যা এই সব কিছুকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে, আর পাইনি এমন কোন স্বচ্ছ ও সুসংবদ্ধ চিন্তা যা জীবনের সমস্ত কার্যকারণকে বিজড়িত করতে পারে। আমার অন্তরে প্রভূত ঘৃণা রয়েছে, সেই ঘৃণা সর্বদা জমাট বাঁধছে এবং কখনও সখনও ক্রোধের সুস্পষ্ট অগ্নিশিখায় ফেটে বেরচ্ছে ; কিন্তু অন্তরে সন্দেহ রয়েছে আরও অনেক বেশী। মাঝে মাঝে তা মন ও প্রাণের কাছে এমন বোঝা হয়ে দাঁড়ায় যে ভেতরে ভেতরে আমি ক্লান্তিতে একেবারে শেষ হয়ে যাই···। কোন কিছুই আমাকে আর স্বাভাবিক করে তুলতে পারে না, হৃদপিন্ড মৃত ব্যক্তির মতো শীতল হয়ে যায়, মন ঘুমিয়ে পড়ে, কল্পনাগুলো দুঃস্বপ্নের দ্বারা তাড়িত হতে থাকে। এই অবস্থা, এই অন্ধ বধির এবং মূক পরিণতি বেশ কয়েক দিন ও রাত ধরে চলে—তখন আমার কোন কামনা, কোন বোধশক্তি থাকে না ; এ পর্যায়ে মনে হয় আমি যেন একটা মৃতদেহ, কোন অজ্ঞাত কারণে আমাকে কবর দেওয়া হচ্ছে না। বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতার ফলে এই ধরনের একটি অস্তিত্বের ভয়ংকরতা আরও বৃদ্ধি পায়, কারণ মৃত্যুর মধ্যে অর্থবহতা রয়েছে অনেক কম আর

অন্ধকার অনেক বেশী···সম্ভবতঃ, ঘৃণা করার বিলাসিতাকেও তা কেড়ে নিয়ে গেছে।

তাহলে, প্রকৃত অর্থে কি আমার বাণী? কি শিক্ষা দিই বলে দাবি করি? যে আমি প্রকৃত আমি? এবং জনগণকে বলবার আমার কিই বা আছে? বহু আগেই মানুষকে যা বলা হয়ে গেছে, সর্বদা তাদের যা বলা হয়, তাই? যা মানুষকে শোনানো হয়, অথচ যাতে তাদের কোন উন্নতি হয় না, তাই? কিন্তু যে আমি তাদের অবলম্বন করে গড়ে উঠে তাদেরই নির্দেশের বিপরীত কর্ম করি, সেই আমার কি অধিকার আছে তাদের এইসব ধ্যান-ধারনার শিক্ষা দেবার? আর সে কাজ করলেও কি তাদের উপর আমার বিশ্বাস আমার প্রকৃত 'আমির' ভিত্তিভূমির উপর দৃঢ়ভাবে প্রোথিত একটি আন্তরিক বিশ্বাস হয়ে উঠত? পাশে বসে থাকা এই লোকটিকে আমি কি বলব? কিন্তু সে আমার উত্তরের অপেক্ষায় থেকে ক্লান্ত হয়ে আবার কথা বলে উঠল।

'যদি আমি না দেখতাম যে উচ্চাশা এখনও আপনার সম্মানকে ধ্বংস করে নি তবে আপনাকে এই প্রশ্নও করতাম না। আমার কথা শোনবার মত সাহস আপনার আছে···। এ থেকেই আমি ধরে নিয়েছি, আপনার নিজের প্রতি সত্যিকারের ভালবাসা রয়েছে, কারণ তা জোরদার করার জন্য নির্যাতনের মুখেও আপনি নিজেকে গুটিয়ে নেন নি। সেই কারণেই আমার সাথে এই সংঘর্ষের যন্ত্রণা থেকে আমি আপনাকে মুক্তি দেব। আপনি ভুল করেছেন কিন্তু দাগী আসামী নন ধরে নিয়ে, আপনার সাথে কথা বলব।'

'কোন একসময়ে মহান পণ্ডিত ব্যক্তিরা, জীবন ও মানবাত্মার নিগূঢ় পর্যবেক্ষকরা, জীবনকে নির্মল করে তোলার অদম্য উদ্দীপনায় উন্মুখ মানুষের উপর গভীর বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত ব্যক্তিরা আমাদের মধ্যে বাস করতেন। তাঁরা যেসব বই লিখেছেন তা কখনও বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাবে না কারণ তাতে রয়েছে শাশ্বত সত্যসমূহ, সেসব বইয়ের পাতা চিরস্থায়ী সৌন্দর্য বিকিরণ করছে। তাঁদের ভাবমূর্তি জীবন্ত, প্রেরণার শক্তিতে প্রাণবন্ত। এসব বইতে সাহস আছে, জ্বলন্ত ক্রোধও আছে; সেগুলো আন্তরিক ও স্বেচ্ছা-প্রেমের সূত্রে বাঁধা, তার মধ্যে একটি অব্যক্ত

শব্দও নেই। আমি জানি এই সমস্ত বই-ই আপনার আত্মাকে পঙ্গু করেছিল…। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি বলব, আপনার আত্মার অপমৃত্যু ঘটে গেছে, কেন না সত্য ও প্রেম সম্পর্কে আপনি যা লেখেন তা মিথ্যা শোনায়, মনে হয় আরোপিত, যেন জোর করে এ সব বলছেন। আপনি চাঁদেরই মতো, প্রতিফলিত আলোয় উজ্জ্বল; আর আপনার আলো ভীষণ ম্যাটমেটে, কেবল ছায়াই বাড়িয়ে চলে, সে মৃদু আলোয় উষ্ণতা লাভ করে না কেউ। আপনি এতই সারশূন্য যে মানুষকে সত্য মূল্যের কোন কিছু দেওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। আর আপনি যা দেন তা মনন ও শব্দের সৌন্দর্য দিয়ে জীবনকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলার চরম আনন্দদানের জন্য দেন না, বরং তা দেন নিজের পেশাগত অস্তিত্বের এই আকস্মিক ঘটনাটিকে মানুষের প্রয়োজনীয় একটি বিশেষ ঘটনা হিসাবে তুলে ধরার জন্য। জীবন ও মানুষের কাছ থেকে আরও বেশী করে নেবার জন্যই আপনি দেন। উপহার দেবার ক্ষমতা আপনার নেই, আপনি নিছকই একজন তেজারতির কারবারী: সুদে নিজ অভিজ্ঞতার অংশমাত্র দেন, আর সেই সুদ মেটাতে হয় আপনার প্রতি মনোযোগ নিবেশ করে। আপনার কলম কদাচিৎ বাস্তবতার দাগ কাটে, সুকৌশলে জীবনের অতি মামুলি জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করে। গতানুগতিক মানুষের একঘেঁয়ে অনুভূতিগুলো বর্ণনা করতে গিয়ে আপনি হয়ত মানুষের কাছে অতি নীচু মানের ঘটনাবলী তুলে ধরেন। কিন্তু আপনি কি তাদের মনে এমন কোন ক্ষুদ্র মোহ সৃষ্টি করতে পারেন যা তাদের আত্মার বিকাশ ঘটায়?…না! আপনি দৃঢ় বিশ্বাস করেন গতানুগতিকতার জঞ্জাল খুঁড়ে তার মধ্যে থেকে সেইসব করুণ ক্ষুদ্র ঘটনাবলী খুঁজে বার করা প্রয়োজন, যা বলে মানুষ নিছকই শয়তান প্রকৃতির, স্থূলবুদ্ধি ও অসৎ। সে সর্বদা সবভাবে ব্যাহ্যিক অবস্থাসমূহের উপরেই নির্ভরশীল। সে বীর্যহীন, হতভাগ্য ও একাকীত্বের মাঝে বিচ্ছিন্ন। আর ইতিমধ্যে আপনি জেনে গেছেন যে সেও হয়ত এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল হয়ে গেছে। কারণ তার আত্মা নিষ্প্রাণ, বুদ্ধি স্থূল…। আর এ ছাড়া কি-ই বা হবে! বইতে যেভাবে তার চিত্র আঁকা হয় সেভাবেই সে সবকিছু দেখে কারণ সেই চিত্র রয়েছে সম্মোহনী প্রভাব—বিশেষ করে তা যদি সেই

কলম দক্ষ হাতে লেখা হয় যা প্রায়ই প্রতিভার প্রকাশ বলে ভুল হয়ে যায়। আপনি যেভাবে কোন মানুষের চিত্র আঁকেন, নিজেকে সে ঠিক সেভাবেই দেখতে থাকে। আর যখন সে দেখে সে কত খারাপ, ভাল হয়ে ওঠার কোন সম্ভাবনা সে আর দেখতে পায় না। আপনি কি তাকে সেই সম্ভাবনা দেখাতে পারেন? আপনি কি সেই গুণ অর্জন করতে পারেন যখন আপনি নিজে··· না আমি আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি, কারণ আমার ধারণা, আমার কথা শুনতে শুনতে আপনি নিজের কাজের সাফাই গাওয়ার ও আমার বক্তব্যকে খন্ডন করার কথা চিন্তা করছিলেন না। শিক্ষক সৎ হলে তাকে অবশ্যই একজন মনযোগী ছাত্র হতে হবে। আপনারা, আজকের শিক্ষকেরা, যা দেন তার চেয়ে অনেক বেশী নেন মানুষের কাছ থেকে, কারণ যা-নেই কেবল তার সম্বন্ধেই আপনারা কথা বলে যান বেশী, আর যা-নেই তাই কেবল দেখেন আপনারা। কিন্তু মানুষেরও বুদ্ধি আছে; ঠিক যেমন আপানারও নিজের কিছু বুদ্ধি আছে—তাই না? এবং আপনারা নিজেদেরকে শিক্ষক ভেবে নিয়ে, শুভ-এর জয়ের পক্ষে অশুভের নিন্দাকারী ভেবে নিয়ে, কি ভাবে সেই সব সাধারণ, ছা-পোষা মানুষ থেকে নিজেদের পৃথক করলেন, যাদের চিত্র আপনারা এত নির্দয় ও বিস্তারিতভাবে আঁকেন? কিন্তু আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন যে শুভ ও অশুভ কেবলই জটা পাকিয়ে যাচ্ছে, যেভাবে দুটো সাদা ও কালো সুতোর গুটি পাশাপাশি থেকে একে অপরের গায়ে রং ঘসাঘসি করে ধূসর বর্ণ হয়ে ওঠে? অবশ্য শুভ ও অশুভের সংগা দেবার যে চেষ্টা আপনারা করেছেন তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। না, আপনারা ঈশ্বর-প্রেরিত নন···। তিনি আপনাদের চেয়েও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি তৈরী করতেন। তিনি তাদের হৃদয় জীবন, সত্য, মানুষের প্রতি উষ্ণ ভালবাসা দিয়ে ভরে দিতে পারতেন। যাতে তারা অন্ধকারের মাঝে তাঁরই শক্তি ও গৌরবের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হয়ে আমাদের আলো দিতে পারেন···। কিন্তু আপনি শয়তানের বিজয়-মশালের মত ধোঁয়া ছড়িয়ে জ্বলেন। আপনার ধোঁয়া মানুষের মনে ও প্রাণে প্রবেশ ক'রে আত্ম-অবিশ্বাসের বিষে তাদের বিষাক্ত করে তুলছে। সুতরাং বলুন: আপনি কি-বানী প্রচার করেন?'

আমি গালে লোকটার গরম নিঃশ্বাস অনুভব করছি। তার চোখে যাতে

আমার চোখ না পড়ে সেজন্য অন্যদিকে তাকিয়ে আছি। আগুনের ফোঁটার মত তার কথাগুলো আমার মস্তিষ্কে জ্বলছে, নিদারুণ জ্বালা বোধ করছি…।

তার সহজ প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া কত কঠিন বুঝে আমি আতংকিত, তাই কোন উত্তর দিলাম না।

'সুতরাং আপনি ও আপনার মত অন্যান্য লেখকেরা যা কিছু লিখেছেন তার একান্ত উৎসাহী পাঠক হিসেবে আমার প্রশ্ন : আপনারা কি উদ্দেশ্যে লেখেন ? আর আপনারা প্রচুর…লেখেন। আপনারা কি মানুষের মনে সমর ভাব জাগাতে চান ? না, শীতল ও বীর্যহীন শব্দ ব্যবহার করে কখনই তা করতে পারবেন না! এবং আপনারা মানুষকে নতুন কিছু তো দিতে পারেনই না। পুরনো জিনিসকেও আপনারা দুমড়ে-মুচড়ে আকারহীন রূপে উপস্থাপিত করেন। আপনাদের লেখা পড়ে আমরা কিছু শিখিও না, কোন কিছু সম্পর্কে লজ্জাও বোধ করি না—যেটুকু লজ্জা বোধ করি তা কেবল আপনাদেরই জন্য। সব কিছুই মামুলি—মামুলি লোকজন, মামুলি চিন্তা, ঘটনা…। কবে মানুষের নির্যাতীত মনের ও তার নবজন্মের প্রয়োজনের কথা বলা হবে ? সৃষ্টির আহ্বান কোথায় ? সাহসের শিক্ষা কোথায় ? কোথায় সেই আশার বানী যা হৃদয়কে জাগ্রত করে ?

'আপনি হয়ত উত্তরে বলতে পারেন জীবন সম্পর্কে আপনারা যা কিছু লিখছেন তা ভিন্ন অন্য কোন চিত্র জীবনে পাওয়া যায় না। কিন্তু তা বলবেন না। কারণ যে মানুষ কথা বলার মতো সৌভাগ্যের অধিকারী তার পক্ষে স্বীকার করা অত্যন্ত লজ্জা ও অপমানের যে জীবনের কাছে সে পরাজিত এবং তার উর্ধ্বে সে উঠতে অক্ষম। আর যদি আপনারা জীবনের স্তরেই দাঁড়িয়ে থাকেন, যদি কল্পনা-শক্তি দিয়ে এমন আঙ্গিক সৃষ্টি করতে না পারেন বাস্তব জীবনে যার এখনও দেখা পাওয়া যায় নি অথচ জীবনের নির্দেশক হিসেবে যার প্রয়োজন আছে, তাহলে আপনাদের সৃষ্টি আর কি-কাজে লাগবে ? কিভাবে আপনারা নিজেদের পেশাকে যুক্তিযুক্ত করবেন ? ভেবে দেখুন, মানুষের মনে তাদের একঘেঁয়ে জীবনের আজেবাজে চিত্রের হুবহু ছাপ ফেলে আপনারা কি ক্ষতিই না করছেন। কারণ নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে আপনারা জীবনের এমন চিত্র আঁকতে অক্ষম, বৈচিত্র মানুষের

মনে প্রতিশোধমূলক লজ্জা ও ভিন্নভাবে বাঁচার জন্য আকুল কামনার জন্য যেন…। আপনারা কি জীবনের নাড়ির স্পন্দন দ্রুততর করতে পারেন? আপনারা কি অন্যদের মত করে জীবনকে উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত করতে পারেন?'

আমার এই অচেনা সঙ্গীটি একটু দম নিল এবং আমি নীরবে তার কথাগুলো ভাবতে লাগলাম।

'চারিদিকে অনেক বুদ্ধিমান লোক দেখতে পাই। অথচ তাদের মধ্যে খুব কম লোকই মহৎপ্রাণ। আর যাদের এই সব অনুভূতি রয়েছে তারাও ভগ্ন-হৃদয়, মানসিকভাবে অসুস্থ। এ ছাড়া আমি সব সময়ই একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, কোন ব্যক্তি যত ভাল, মন তার যত পবিত্র ও সৎ, কোন না কোন কারণে তার উদ্দীপনা তত কম, তার বেঁচে থাকা তত বেদনা-দায়ক ও কষ্টকর। এইসব ব্যক্তির কপালে আছে একাকিত্ব ও দুঃখ। কোন ভাল কাজ করার যতই আকাঙ্ক্ষা থাকুক না কেন, তা করাবার শক্তি তাদের নেই। সময় মতো জাগরণী কথা দিয়ে সাহায্য করা হয় নি বলেই কি তারা এরকম অবদমিত ও অসহায় নন?'

অচেনা সঙ্গীটি বলে যেতে লাগল, 'আর তাছাড়াও, আপনারা কি এমন আনন্দোচ্ছল হাসি হাসাতে পারেন যা মনকে পরিষ্কার করে? চারিদিকে তাকিয়ে দেখুন! মানুষ ভালভাবে হাসতে ভুলে গেছে! তারা হাসে তিক্ততায় বিদ্বেষে প্রায়ই চোখের জল ফেলতে ফেলতে। কিন্তু কখনও আপনি তাদের আনন্দের হাসি, আন্তরিক হাসি শুনতে পাবেন না। আপনি এমন আন্তরিক হাসি শুনতে পাবেন না যা মাঝে মাঝে পূর্ণ-বয়স্ক মানুষের মধ্যে থেকে আসা উচিত, কারণ ভাল হাসি আত্মাকে পরিপুষ্ট করে তোলে…। মানুষকে অবশ্যই হাসতে হবে, কারণ পশুদের চেয়ে যে সামান্য কটা বেশী সুবিধা সে ভোগ করে হাসি তার মধ্যে একটা। আপনি কি মানুষের মনে এমন হাসি জাগাতে পারেন যা নিন্দার হাসি নয়, যা আপনার প্রতি, হাস্যকরভাবে বিধ্বস্ত মানুষের প্রতি কটাক্ষপূর্ণ নয়? বুঝতে চেষ্টা করুন, আপনার শিক্ষা দেবার অধিকারের যথেষ্ট ভিত্তি থাকতে হবে। আন্তরিক অনুভূতি জাগ্রত করার ক্ষেত্রে আপনার ক্ষমতাই হচ্ছে সেই

ভিত্তি, প্রেরণা ও ক্ষমতা সম্পন্ন এমন আন্তরিক অনুভূতি যা এক ধরনের জীবনকে ধ্বংস ক'রে অন্য ধরনের জীবন, অপেক্ষাকৃত স্বাধীন এক জীবন সৃষ্টি করতে পারে। ক্রোধ, ঘৃণা, সাহস, লজ্জা ও অনুভূতির আকস্মিক পরিবর্তন যা ভয়ঙ্কর বেপরোয়া ভাব—এগুলোই হচ্ছে হাতিয়ার যা দিয়ে পৃথিবীর সব কিছু ধ্বংস করা যায়। আপনারা কি এই সব হাতিয়ার তৈরী করতে পারেন? সে গুলোকে কি সক্রিয় করে তুলতে পারেন? মানুষকে উপদেশ দেবার অধিকার অর্জন করতে হ'লে আপনাদের মনে, হয় তাদের ত্রুটীর জন্য প্রচণ্ড ঘৃণা, না হয় তাদের দুঃখে তাদের প্রতি বিরাট ভালবাসা পোষণ করতে হবে; আর যদি আপনাদের প্রাণে এই রকম কোন অনুভূতি না থাকে, তা হলে আর একবার যথেষ্ট বিনয়ের সাথে ভেবে দেখুন তাদের··· বিষয়ে কিছু বলবেন কি না।'

দিনের আলো ফুটছে, কিন্তু আমার মনে ক্রমেই বেশী বেশী অন্ধকার জমা হচ্ছে। এবং এই যে লোকটি যার কাছে কিছুই গোপন নয়, সে কথা বলেই যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, 'লোকটা কি মানুষ?'

কিন্তু আমি লোকটার কথায় এমন আচ্ছন্ন হয়ে আছি যে এই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ভাববার কোন সময় পেলাম না—তার আগেই আবার তার কথা সূঁচের মত আমার মস্তিষ্কে খোঁচা মারতে আরম্ভ করল।

'জীবন আরও বেশী সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠছে, নতুন নতুন দিকে তার বিস্তার ঘটছে, আরও গভীরে সে আঘাত হানছে, যদিও প্রক্রিয়াটি খুব ধীর-গতিসম্পন্ন কারণ তাকে ত্বরান্বিত করবার শক্তিও নেই, দক্ষতাও নেই আমাদের। হ্যাঁ, জীবন বেশী বেশী করে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠছে এবং প্রতি দিন মানুষ প্রশ্ন করতে শিখছে। কে উত্তর দেবে? উত্তর দেওয়া উচিত আপনাদের—আপনারা যারা স্বয়ং-নিযুক্ত দূত। কিন্তু অন্যকে বোঝাবার মত যথেষ্ট ভাল করে কি আপনারা জীবনকে বোঝেন? আপনারা কি আমাদের যুগের দাবিগুলো বোঝেন? ভবিষ্যৎ পরিণতিকে অনুধাবন করার ক্ষমতা কি আপনাদের আছে? এবং যেলোক জীবনের আস্তাকুঁড়ে বাস বাস ক'রে কলুষিত হয়ে গেছে, যে বিধ্বস্ত ও হতোদ্যম তাকে জাগ্রত করার জন্য আপনি কি-বলতে পারেন? মানুষ হতোদ্যম, জীবনে তার উৎসাহ

দুঃখ কম, সসম্মানে বেঁচে থাকার কামনা আজ প্রায় শেষ।

সে যেন-তেন-ভাবে শুয়োরের মত বাঁচতে চায় এবং—শুনেছেন?—'আদর্শ' শব্দটা শুনলেই সে গোঁয়াড়ের মত হেসে ওঠে; মাংস ও মোটা চামড়ার আবরণে মানুষ একটা হাড়ের ঢিবিতে পরিণত হচ্ছে, এবং এই অসৎ ঢিবিটা আর প্রেরণার দ্বারা চালিত হচ্ছে না, হচ্ছে লালসার দ্বারা। মানুষের প্রতি নজর দেওয়া দরকার। চটপট করুন! সে মানুষ থাকতে থাকতেই তাকে বাঁচতে সাহায্য করুন! কিন্তু যখন আপনারাই গোঙান, আর্তনাদ করেন ও দীর্ঘশ্বাস ফেলেন অথবা নিষ্প্রাণ ঔদাসীনতা নিয়ে যখন আপনারাই তাদের বিভেদের ব্যাখ্যা করেন, তখন তাদের বেঁচে থাকবার কামনা জাগাবার জন্য আপনাদের কি-ই বা করার আছে? জীবন অবক্ষয়ের দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে; ভীরুতা ও গোলামীতে হৃদয় সম্পৃক্ত; আলস্যের কোমল বাঁধনে মন ও হাত বাঁধা…। এইসব দুর্নীতির বিশৃঙ্খলার মধ্যে আপনি কোন্ জিনিস প্রবেশ করাতে চান? আপনি কত নগন্য, কত অসহায়! আপনাদের মতো আর কজনই বা আছে। ওঃ, যদি জ্বলন্ত হৃদয় ও শক্তিশালী সর্ব-ব্যাপ্ত মানসিকতা নিয়ে একজন কঠোর, প্রিয় ব্যক্তি আসতেন! লজ্জাকর নীরবতার এই দূষিত পরিবেশ যদি ভবিষ্যদ্বানীতে মুখরিত হয়ে উঠত, যদি তা ঘণ্টাধ্বনির মত বাজত, তবেই এই জীবন্মৃতদের ঘৃণ্য আত্মাগুলোকে কর্মচঞ্চল করে তোলা যেত…।'

এই কথাগুলো বলে সে দীর্ঘক্ষণ নীরব হয়ে রইল। আমি আর তার দিকে তাকালাম না। এখন ঠিক মনে করতে পারছি না কোনটা বেশী অনুভব করছি—লজ্জা না ভয়।

'আমাকে আপনার কি বলার আছে?' একটি নিরপেক্ষ প্রশ্ন এল।

'কিছু বলার নেই।' আমি উত্তর দিলাম।

আবার নীরবতা নেমে এল।

'তাহলে আপনি এখন বাঁচবেন কি ভাবে?'

'জানি না।' উত্তর দিলাম।

'আপনি কি-বলবেন?'

আমি চুপ করে রইলাম।

'নীরবতার চেয়ে অধিক জ্ঞানের আর কিছু নেই।'

এই কথাগুলো ও তার পরবর্তী হাসির মধ্যে সময়ের যে ফাঁকটুকু রয়েছে তাতে গা জ্বলে যায়। সে খুশীভরে এমনভাবে হেসে উঠল যেন বহুক্ষণ সে এত খোলা মনে ও আনন্দের সাথে হাসবার সুযোগ পায় নি। কিন্তু সেই জঘন্য হাসি আমার হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করে দিল।

'হাঃ, হাঃ! আর আপনিই হচ্ছেন কিনা জীবনের অন্যতম শিক্ষক, যে আপনি এত সহজেই বিভ্রান্ত হয়ে যান? হাঃ, হাঃ, হাঃ···এবং মুখবন্ধুগণ, আপনারা যারা অন্ধ-বন্ধ, আপনারা প্রত্যেকেই যদি আমার সাথে কথা বলতে রাজী হন তাহলে একইভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন। যে মিথ্যা, গোঁয়ার্তুমি ও লজ্জাহীনতার বর্মে নিজেকে ঢেকে ফেলেছে, কেবলমাত্র সে-ই তার নিজের বিবেকের বিচারের কাছে অবিচলিত থাকবে। সুতরাং এই হচ্ছে আপনাদের শক্তি—একটি মাত্র ধাক্কাতেই পতন। কি হল, কিছু বলুন, আত্মরক্ষার জন্য কিছু বলুন; আমার কথা খন্ডন করুন! লজ্জা ও অনুশোচনা থেকে নিজের মনকে মুক্ত করুন। ক্ষণিকের জন্য হলেও নিজের কিছু শক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয় দিন, তা হলেই আমি আপনার মুখের উপরে যেসব কথা ছুঁড়ে দিয়েছিলাম সেসব ফিরিয়ে নেব। আমি আপনার কাছে মাথা নত করব···। আপনি প্রমাণ করুন যে আপনার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যার দ্বারা আমি আপনাকে শিক্ষক হিসাবে মেনে নিতে পারি। আমিও একজন শিক্ষক চাই, কারণ আমিও মানুষ; আমি জীবনের অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেছি। আলো, সত্য, সুন্দর ও নতুন জীবনের পথ খুঁজছি—পথ দেখান! আমিও একজন মানুষ। আমাকে মারুন, ঘৃণা করুন, কিন্তু জীবনের প্রতি এই উদাসীনতার পিচ্ছিল মাটি থেকে টেনে বার করে নিয়ে যান! আমি যা আছি তার থেকে ভাল হতে চাই। কি করে তা করা যায়? শিখিয়ে দিন কি ভাবে সম্ভব!'

আমি ভাবি: এই লোকটা যেভাবে আমাকে তার দাবি পূরণ করতে বলছে, যথাযথভাবে কি তা আমি করতে পারি? আমি কি তা করতে পারব? জীবন সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, মানুষের মন ক্রমবর্ধমান সন্দেহে ভরে গেছে। একটা রাস্তা খুঁজে বার করতেই হবে। কোথায় সেই রাস্তা?

আমি শুধু এটুকুই জানি কেবলমাত্র সুখের জন্যই কারো সচেষ্ট হলে চলবে না। কেন শুধু সুখের জন্য সচেষ্ট হওয়া? এর মধ্যে জীবনের উদ্দেশ্য নিহিত নেই এবং কল্পিত-আত্মতৃপ্তির দ্বারা মানুষ কখনই সন্তুষ্ট হবে না; অন্ততঃ সে এর ঊর্ধ্বে। সুন্দর ও সাফল্যের শক্তির মধ্যেই জীবনের অর্থ বিদ্যমান, আর আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি মুহূর্তেরই থাকবে উচ্চ লক্ষ্য। তা হওয়া সম্ভব। কিন্তু জীবনের পুরাতন চৌহদ্দির মধ্যে নয়, কারণ তা এতই সংকীর্ণ যে সেখানে সকলের সংকুলান হবে না, সেখানে মানবাত্মার কোন স্বাধীনতা নেই···।

সে আবার হাসছে, কিন্তু এখন মৃদুভাবে; এ হাসি এমন একজন লোকের হাসি যার হৃদয় চিন্তায় ক্ষতবিক্ষত।

'এ পৃথিবীতে কত লোক জন্মেছেন, অথচ মনে রাখবার মত কোন অবদান রেখে গেছেন এমন লোকের সংখ্যা কত কম! কেন এমন হল? তবুও আসুন আমরা অতীতের জয়গান গাই—অতীত কতই না ঈর্ষা জাগ্রত করে। মৃত্যুর পরেও চিহ্ন রেখে যাবার মত কেউ নেই। মানুষ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন—কেউ তাকে জাগাতে চায় না। ঘুমিয়ে থাকতে থাকতে সে পশুতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। এখন দরকার চাবুক মারা এবং তারপর চাবুক রেখে উদ্দাম ভালবাসা দেওয়া। তাকে আঘাত করতে ভয় পাবেন না; যদি ভালবাসা দিয়ে আঘাত করেন সেও আপনার আঘাত বুঝতে পারবে এবং সেই আঘাতকে নিজের প্রাপ্য হিসাবেই নেবে। এবং যখন সে নিজের লজ্জা ও যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠবে, তখন তার প্রতি আন্তরিক যত্ন নিতে হবে, আর তখনই ঘটবে তার পুনর্জন্ম···। জনগণ? মাঝেমাঝে তাদের অপকর্ম ও চিন্তার বিকৃতির দ্বারা আমাদের বিস্মিত করলেও তারা এখনও শিশু। সর্বদাই তাদের ভালবাসার, তাদের আত্মার জন্য সজীব ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যের যোগান দেওয়া প্রয়োজন···। আপনি কি মানুষকে ভালবাসতে পারেন?'

'মানুষকে ভালবাসা?' আমি সন্দেহভরে কথাটার পুনরুচ্চারণ করলাম, কারণ সত্যিই জানি না আমি তাদের ভালবাসি কিনা। আর এখন একনিষ্ঠ হতে হবে—না, আমি জানি না। কে নিজের হয় বলতে পারে: আমি

মানুষকে ভালবাসি। যে কোন লোক, যে নিজেকে সঠিকভাবে লক্ষ্য করে, এই প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ বলতে গিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবে। আমরা সকলেই জানি আমাদের আত্মীয়-স্বজনেরা প্রত্যেকের কাছ থেকে কত দূরে।

'আপনি চুপ করে আছেন ? কিন্তু যদিও আপনার বলার কিছুই নেই, আমি আপনাকে বুঝতে পারছি··· । আর এখন আমি আপনার কাছ থেকে বিদায় নেব।'

'এর মধ্যেই ?' আমি নম্রভাবে জিজ্ঞেস করলাম, কারণ তাকে ভয় পেলেও নিজেকে ভয় পাচ্ছি আরও অনেক বেশী।

'হ্যাঁ এখন আপনার কাছ থেকে বিদায় নেব··· । আমি আবার আসব এবং শুধু যে একবারই আসব তা নয় কিন্তু। অপেক্ষা করুন।'

সে চলে গেল।

কিভাবে সে গেল ? তাকে দেখতে পেলাম না। ছায়ার মত দ্রুত, নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল··· । আমি বহুক্ষণ পার্কের বেঞ্চে বসে রইলাম। ঠাণ্ডার কথা খেয়াল নেই। সূর্য উঠেছে, গাছের বরফ-ঢাকা ডালপালার উপর যে আলো ঝলমল করছে এই ঘটনার দিকেও খেয়াল নেই। এই পরিষ্কার দিনটি দেখে, আগের মতই সূর্যের এই উদাসীন আলোর ছটা দেখে এবং সূর্যের আলোয় অসহনীয় ঝলমলে তুষারের কম্বলে ঢাকা এই প্রাচীন যন্ত্রণাক্লিষ্ট পৃথিবীকে দেখে আমার অচেনা লাগছে।

# প্রথম প্রেম

আমার শিকাকে সম্পূর্ণ করার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই ভাগ্য আমার প্রথম প্রেমের বন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আমার প্রথম প্রেম ছিল বিরহ-মিলনের আলো-ছায়ায় ঘেরা।

বন্ধুরা কয়েকজন মিলে ওকা নদীতে নৌকা বাইবার আয়োজন করেছিল। মিঃ 'ক' ও তার স্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানাবার দায়িত্ব পড়েছিল আমরাই উপরে। সম্প্রতি ফ্রান্স থেকে ফিরেছে এই দম্পতি—এদের আগে কখনও দেখিনি। সন্ধ্যেবেলা তাদের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

একটা পুরোনো বাড়ির মাটির-তলার ঘরে তারা থাকে। বাড়িটার সামনে, রাস্তার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত, সারা বসন্তকাল ও গ্রীষ্মের প্রায় সবসময়ই জল জমে থাকে। কাক ও কুকুর সেই জমা-জলে মুখ দেখে, আর শুয়োরেরা স্নান করে।

এমনই আনমনা ছিলাম যে হুড়মুড় করে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলাম—অন্যের বিরক্তির বিষয়টা খেয়ালই ছিল না। একটি নাদুস-নুদুস লোক বাঁকা ভুরুতে দেখা করতে বেরিয়ে এল। লোকটির উচ্চতা মাঝারি, গালভর্তি ঘন বাদামী দাড়ি, কিন্তু নীল চোখজোড়া বেশ প্রসন্ন। দরজা আড়াল করে সে আমার সামনে দাঁড়াল। পোষাক ঠিক করতে কাঠখোট্টা গলায় বলে উঠল, 'কি চাই?' তারপরই ধমকের সুরে বলল, 'বাড়িতে ঢোকার আগে কড়া নাড়া উচিত।'

লোকটার পেছনে, ঘরের আবছা আলোয়, বড় সাদা পাখীর মতো কিছু একটা দেখতে পেলাম—পাখীটা যেন ছটফট করছে। আর তারপরই একটা পরিস্কার, প্রাণোজ্জল কণ্ঠস্বর ভেসে এল :

'বিশেষ করে কোন বিবাহিত দম্পতির বাড়িতে এলে।'

আমি বিরক্তিভরে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁরাই আমার লক্ষ্য-ব্যক্তি কিনা। শাঁসালো ব্যবসায়ীর বপু নিয়ে লোকটা যখন আমায় নিশ্চিত করল যে তারাই সেই ব্যক্তি, বুঝিয়ে বললাম কেন এসেছি।

'কি বললে, ক্লার্ক তোমায় পাঠিয়েছে?' লোকটা গম্ভীরভাবে দাড়িতে

হাত দোলাতে দোলাতে কথাটা পুনরাবৃত্তি করল। হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠল, 'উঃ! জ্বালা!' এবং শরীরের সেই অংশটা চেপে ধরে উল্লাসে কয়েক বার অশ্লীল খেলা যা ভদ্রসমাজে উচ্চারণ করা যায় না। মনে হ'ল সে যেন ওখানে চিমটি খেয়েছে।

দরজায় লোকটার জায়গায় এসে দাঁড়াল একটি ছিপছিপে তন্বী মেয়ে। হাসিভরা নীলচোখে সে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল।

'তুমি কে? পুলিশ?'

'না না। আমার প্যান্টটাই ঐরকম।' আমি বিনম্র উত্তর দিলাম।

সে হাসল। কিন্তু আমি রাগ করতে পারলাম না, কারণ তার চোখে যে দ্যুতি ফুটে উঠেছে, বহুদিন ধরে যেন তারই সন্ধানে ছিলাম। আমার পোশাকেই যে তার হাসি পেয়েছে, তা ঠিক। আমার পরনে রয়েছে ফুলপ্যান্ট ও সাদা বাবুর্চি-জ্যাকেট। পোশাকের মধ্যে জ্যাকেটই সবচেয়ে সুবিধাজনক। স্যুট-কোটের পরিবর্তে পরা যায়, আর গলা অবধি বোতাম লাগালে তলায় জামা না পরলেও চলে। সাথে ধার-করা শিকারের বুট এবং ইতালীয় গুন্ডাদের মতো চওড়া টুপি থাকায় ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে।

মেয়েটি আমার কনুইয়ের কাছে হাতা ধরে টেনে ধরে নিয়ে গিয়ে টেবিলের দিকে ঠেলে দিল।

'এমন উদ্ভট পোশাক পরেছ কেন?' সে প্রশ্ন করল।

'উদ্ভট? কেন?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, রাগ করতে হবে না।' সে অনুনয় করে বলল।

কি অদ্ভুত মেয়েরে বাবা! এর উপর রাগ করে কার সাধ্য? দাড়িওয়ালা লোকটা বিছানায় বসে সিগারেট পাকাচ্ছে। চোখের ইশারায় তাকে দেখিয়ে প্রশ্ন করলাম: 'বাবা, না ভাই?'

'ওর স্বামী,' লোকটা নিজেই জবাব দিল। আর মেয়েটি হেসে বলল, 'এ প্রশ্ন কেন?'

এক লহমায় মেয়েটির মুখের ভাব লক্ষ্য করে বললাম, 'মাপ কর।'

আমরা আরও মিনিট পাঁচেক এলোমেলো কথা চালালাম। আমি কিন্তু খুবই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলাম, এবং মনে হল স্বেচ্ছায় এই নীচের-তলার ঘরে

পাঁচ ঘণ্টা, পাঁচ দিন বা বছরের পর বছর বসে তার সুন্দর ডিম্বাকৃতি মুখ ও স্নিগ্ধ চোখের সুধা পান করে কাটিয়ে দিতে পারি। তার ছোট্ট মুখের নীচের ঠোঁটটা ওপরের চেয়ে বেশী পুরুষ্টু,—মনে হয় ঈষৎ ফোলা। বাদামী রঙের ঘন চুল ক্লিপ এঁটে ছোট করা হয়েছে। শামুকের খোলার মতো তার খোঁপা কান ও গোলাপী গালের পাশ দিয়ে ঘুরে মাথার উপরে হাল্কা টুপির মতো বসে আছে। তার হাত ও বাহু অনির্বচনীয়; দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়ানোর ফলে কনুই অবধি নগ্ন বাহু দেখতে পেলাম। মেয়েটির পোশাক অত্যন্ত সাধারণ—কোমর পর্যন্ত ফুলহাতা সাদা সার্ট, হাতার প্রান্তে ঝুলছে লেস আর আছে অত্যন্ত মানানসই সাদা স্কার্ট। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তার চোখজোড়া। সেই চোখ থেকে কি আনন্দ, সমবেদনা ও সৌহার্দপূর্ণ কৌতূহলই না বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এবং তারও উপরে, সেই চোখজোড়া ঠিক সেই হাসিতেই উজ্জ্বল (এই বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না!) যার জন্য একটি কুড়ি বছরের যুবক আকুল কামনা করে, বিশেষতঃ যার হৃদয় বাস্তবের টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত।

'এখুনি বৃষ্টি নামবে', তার স্বামীটি দাড়িতে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে জানান দিল।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম। আকাশ পরিষ্কার ও নক্ষত্র-খচিত। উঠবার ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে চলে এলাম। কিন্তু দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত কামনার ধন পেলে কোন ব্যক্তি যে প্রশান্ত আনন্দ লাভ করে, আমি সেই আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেছি।

সারারাত ধরে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়িয়ে সেই কোমল নীল চোখের দ্যুতির স্মৃতি রোমন্থন করলাম। সকালে এই প্রত্যয় জন্মাল যে দাড়িওয়ালা খাদ্য-পরিতৃপ্ত মার্জারের নিস্পৃহ-দৃষ্টিসম্পন্ন ঐ হৃষ্টপুষ্ট বিশাল বপুটি তার স্বামী হবার যোগ্য নয়। সত্যি কথা বলতে কি, আমি তার জন্য দুঃখ বোধ করলাম, হায় হতভাগিনী! ঐ রকম একটা লোকের সাথে ঘর করার কথা চিন্তাই করা যায় না যার দাড়িতে রুটির গুঁড়ো আটকে থাকে!

পরের দিন আমরা অন্ধকারাচ্ছন্ন ওকা নদীতে নৌকো বাইতে গেলাম। ওকা নদীর দুই পাড় অনেক উঁচু। নানা রঙে চিত্রবিচিত্র মাটির স্তরের

জোয়া-ঘাসে ভরা। সৃষ্টির আদিকাল থেকে এটাই ছিল সুন্দরতম দিন। উপসমুদ্রের আকাশে সূর্য আলো ছড়াচ্ছিল, নদীর বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল পাকা স্ট্রবেরীজের মিষ্টি গন্ধ, মানুষেরা নিজেদের সদাসরতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল, আর তার ফলে আমার মন তাদের প্রতি ভালবাসা ও আনন্দে ভরপুর হয়ে গিয়েছিল। এমন কি আমার প্রেমিকার স্বামীটিও অতি চমৎকার মানুষে পরিণত হয়ে উঠেছে। স্ত্রীর নৌকায় সে ওঠেনি, নৌকাটা আমিই বাইছিলাম। সারাদিন সে নম্র ব্যবহার করেছে। প্রথমে সে আমাদের গ্ল্যাডস্টোন সম্পর্কে মজার মজার গল্প বলে, তারপর এক মগ সুস্বাদু দুধ খেয়ে একটা গাছের নীচে টানটান শুয়ে শিশুর মতো রাত অবধি ঘুমোয়।

স্বাভাবিকভাবে আমাদের নৌকাটাই পিকনিক-এর জায়গায় সবার আগে এসে পেঁছায় এবং আমার আরাধ্যাকে কোলে করে নামিয়ে আনতেই সে বলল:

'তোমার কি শক্তি!'

মনে হল আমি সর্বোচ্চ গির্জাটাকেও উপড়ে ফেলতে পারব। তাকে বললাম যে আমি অনায়াসে তাকে কোলে করে শহরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি। (শহর এখান থেকে সাত ভার্স্টের কম নয়)। নিশ্চিত করে বলতে পারি না আমি সত্যই এতখানি বীরত্বপূর্ণ কাজ করতে পারব কি না। সে মিষ্টি হেসে অপাঙ্গে আমার শরীরে দৃষ্টি বুলিয়ে দিল। সারাদিন তার চোখের দ্যুতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে রইলাম, এবং হলফ করে বলতে পারি তার চোখের সেই উজ্জ্বলতা ছিল কেবল আমারই জন্য।

ঘটনা দ্রুত এগোতে লাগল, আর সেটা আশ্চর্যেরও কিছু নয়। কারণ এই যুবতী নারী আগে কখনও এমন আজব জন্তু দেখেনি, এবং জন্তুটিও সেই নারীর আদর পাবার জন্য আঁকড়ে পড়ে আছে।

কয়েক দিনের মধ্যেই জানতে পারলাম, দেখতে পূর্ণযৌবনা হলেও সে আমার চেয়ে দশ বছরের বড়। বেলোস্টকের স্কুল অব ইয়াং ওমেন অব দি নোবিলিটি থেকে গ্রাজুয়েট হয়েছে। সে পিটার্সবার্গের উইন্টার প্যালেসের এক কম্যান্ডান্টের সঙ্গে প্রণয়াবদ্ধ ছিল, প্যারিসে বসবাস করেছে, এবং চিত্রকলা ও ধাত্রীবিদ্যা নিয়ে পড়াশুনা করেছে। পরে আরও জানা গেল, তার

মা-ও একজন ধাত্রীবিদ্ ছিলেন এবং তিনিই আমায় এই পৃথিবীতে আনায় সাহায্য করেছিলেন। আমি এই ঘটনাটির শুভ ইঙ্গিত পেয়ে আনন্দিত হয়ে উঠি।

বোহেমিয় ও রাজনৈতিক দেশান্তরীদের সাথে তার সংহতি, অনেক রাজনৈতিক দেশান্তরীর সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, নীচের-তলার ঘরে তাদের অর্ধাহার অর্ধ-যাযাবর জীবন এবং প্যারিস, পিটার্সবুর্গ ও ভিয়েনার সুচারু কৃষ্টি তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে বেশ মজার অস্থিরতা এবং অসাধারণ আকর্ষণ এনে দিয়েছে। উঠতি যুবতীর মতোই সে প্রগলভ। চতুর স্কুলের মেয়ের কৌতূহল নিয়েই সে জীবনকে, মানুষকে দেখে। যথেষ্ট আবেগ দিয়ে ফরাসী গান গায়। সুচারু ভঙ্গিতে সিগারেট খায়, দক্ষতার সাথে ছবি আঁকে, অভিনেত্রী হিসেবেও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে এবং পোশাক ও টুপি বানানোয় সুদক্ষ কারিগর। কেবল ধাত্রীবিদ্যা নিয়েই কোন চর্চা করেনি।

'আমি সারা জীবনে মাত্র চারটি রুগী পেয়েছি এবং তাদের বারো আনাই মরে গেছে', সে বলেছিল।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পরোক্ষ সাহায্যের প্রতি তার সার্বিক অনীহার এটাই যথেষ্ট কারণ ছিল। আর প্রত্যক্ষ সাহায্যের ক্ষেত্রে একটি চার বছরের চমৎকার মেয়েই হচ্ছে তার এই বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ যোগ্যতার প্রমাণ। সে যখন নিজের সম্বন্ধে বলে তখন মনে হয় এমন একজনের সম্পর্কে বলছে যাকে সে ঘনিষ্ঠভাবে চেনে, যার সম্পর্কে সে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে পড়েছে। কখনও সখনও এমন মনে হয় যে সে তাকে বিস্মিত করে তুলেছে : তার চোখজোড়া চমৎকারভাবে কালো হয়ে ওঠে, এবং তার গভীরে খেলে যায় মৃদু সলজ্জ হাসি। লাজুক শিশুরা এভাবেই হাসে।

তার দ্রুত-অনুরাগী হয়ে ওঠা মন সম্পর্কে আমি সচেতন। সে যে আমার চেয়ে বেশী শিক্ষিতা তা জানি। আর পারিপার্শ্বিক মানুষজনের সাথে যে-উদার প্রসন্নতা নিয়ে সে মেলামেশা করে তাতে আমি বিস্মিত। আজ পর্যন্ত যত মেয়ে, বা মহিলার সাথে পরিচিত হয়েছি, সে তাদের প্রত্যেকের চেয়ে লক্ষগুণ বেশী আকর্ষণীয়া। যেরকম সহজভাবে সে আমার

সাথে গল্প করে তাতে মুগ্ধ হয়ে যাই। আর তা আমার মনে এমন বিশ্বাস এনে দেয় যে মনে হয়, আমার বিপ্লবী-মনোভাবাপন্ন বন্ধুদের জ্ঞানভাণ্ডারের সব তার আয়ত্তে, উপরন্তু তার ভাণ্ডারে রয়েছে আরও বেশী কিছু সম্পদ। সেই জ্ঞান আরও বেশী কিছু, আরও বেশী মূল্যবান। ফলে বয়স্ক লোকেরা যেমন শিশুদের মজার খেলা, বিপজ্জনক খেলাও, হাসিমুখে লক্ষ্য করে, তেমনি হাসি মুখে সেও দর্শকের মতো সবকিছু দূরে থেকেই লক্ষ্য করত।

নীচের-তলায় তার থাকবার কোয়াটার্স-এ ছিল মাত্র দুটো ঘর: একটা ছোট্ট রান্নাঘর, যেটা দিয়েই ভেতরের ঘরে ঢুকতে হয়, আর একটা বড় ঘর। বড় ঘরটার তিনটে জানলা রয়েছে রাস্তার দিকে এবং বাকি দুটো আবর্জনা-পূর্ণ একটা উঠোনের দিকে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে কোন মুচির কাছে হয়ত ঐ কোয়াটার্স খুবই আরামদায়ক হতে পারে, কিন্তু তার মত একজন মহীয়সী নারীর কাছে আদৌ তা নয়। সে তো বিপ্লবের ঐতিহ্য, মলিয়ের, বিউমারচাইস, হুগো প্রমুখের পবিত্র নগরী প্যারিসে বসবাস করে এসেছে। ছবি ও ছবির ফ্রেমের মধ্যে এরকম বৈষম্য আরও অনেক ছিল। এ সমস্ত কিছুই আমার বিরক্তি উদ্রেগ করেছিল এবং অন্যান্য অনুভূতির মধ্যে তা আমার মনে এই মহিলার প্রতি সমবেদনার অনুভূতিও জাগ্রত করে। অথচ যেসব বিষয়ে তার গভীরভাবে বেদনাহত হওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়েছে, সেসব বিষয়ে সে নিজে ছিল সম্পূর্ণই উদাসীন।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে ব্যস্ত থাকত। সকালে করত রান্নাবান্না ও ঘরের কাজ। তারপর জানলার নীচে বড় টেবিলে বসে হয় শহরের বিখ্যাত লোকেদের ফটো দেখে পেন্সিলের ছবি আঁকা, না হয় ম্যাপ এঁকে রঙ করা, অথবা স্বামীকে গ্রামীন সংখ্যাতত্ত্বের বই সংকলনে সাহায্য করা। রাস্তার ধুলো-ময়লা খোলা জানলা দিয়ে উড়ে এসে পড়ত তার মাথায়, টেবিলে এবং পথিকের পায়ের কালো ছায়া পড়ত তার কাগজপত্তরে। সে কাজ করতে করতে গান গায় এবং বসে থেকে থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়লে উঠে পড়ে ও চেয়ার ঘিরে ওয়ালজ্ নৃত্য করে বা মেয়ের সাথে খেলায় মেতে ওঠে। এতসব নোংরা কাজকর্ম করা সত্ত্বেও সে সবসময়ই বিড়ালছানার মত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন।

তার স্বামীটি কুঁড়ে ও গোবেচারা। শোবার সময় ফরাসী উপন্যাস পড়ে, বিশেষ করে ডুমাস পেরির। লোকটি বলে, 'এগুলো তোমাদের মস্তিষ্কের মিলদ্কোষ থেকে আবর্জনা পরিষ্কার করে দেবে।' সে জীবনকে দেখে, 'সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে'। রাতের খাওয়াকে বলে, 'পুষ্টির আত্মকরণ' এবং খাওয়া হয়ে গেলে বলে ওঠে :

'খাদ্যকে পাকস্থলী থেকে শরীরের কোষে কোষে পরিবাহিত করতে হলে সমস্ত প্রণালীটাকে পুরোপুরি বিশ্রাম দেওয়া দরকার।'

আর তাই সে বিছানায় গিয়ে ওঠে এবং দাড়ি থেকে রুটির টুকরোগুলো পর্যন্ত না ঝেড়ে কয়েক মিনিটের জন্য ডুমাস অথবা ডি মন্টেপিন পড়ে এবং পরবর্তী ঘন্টা দুয়েক নাক ডেকে মহাসুখে ঘুম লাগায়। ফলে তার নরম গোঁফজোড়া নড়েনড়ে ওঠে, মনে হয় যেন কোন অদৃশ্য পোকা ওখানে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। ঘুম থেকে উঠে কিছুক্ষণ ছাদের ফাটলের দিকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে থেকেই বলে ওঠে :

'গতরাতে কুজমা, পারনেল-এর চিন্তাধারার একটা ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছিল।'

আর তার ঠিক পরেই কুজমার ভুল ভাঙিয়ে দেবার জন্য সে যাত্রা করে এবং যাবার আগে স্ত্রীকে বলে যায়: 'তুমি সেইডান ভোলস্ট-এর সংখ্যাগুলোর হিসেব করে রেখো না গো! আমি যাবো আর আসব।'

মধ্যরাত বা তারও পরে সে উৎফুল্ল চিত্তে ফিরে আসে।

'আমি কুজমাকে আগেই বলেছিলাম। ওর স্মরণশক্তি আছে ঠিক, কিন্তু আমরাও কম নেই। আর হ্যাঁ, ও গ্ল্যাডস্টোনের প্রাচ্য-নীতির প্রাথমিক কথাটাই বোঝে নি।'

সবসময়ই সে বিনেট দিচেট এবং মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলে, আর কখনও বৃষ্টিতে আটকে ঘরে থাকলে স্ত্রীর শিশুকন্যাটিকে পড়াতে বসে যায়। কন্যাটি দুটো প্রেমের মাঝপথে কোন এক সময় হঠাৎই জন্মেছিল।

'লোলিয়া, সবসময় খাবার ভাল করে চিবিয়ে খাবি, দেখবি হজম ভাল হবে। কারণ, ভাল করে চিবোলে খাদ্য রাসায়নিক মণ্ডে পরিণত হয়ে শরীরে মিশে যায়।'

রাতের খাওয়া সম্পন্ন হলে সে নিজের পরিপাক প্রণালীটিকে 'সম্পূর্ণ

'বিশ্রাম' দেবার অবস্থায় নিয়ে আসে। শিশুটিকে নিজের বিছানায় তুলে নিয়ে গল্প-বলার মতো করে বলতে শুরু করে :

'আর তাই যখন দাম্ভিক ও রক্তলোলুপ নেপোলিয়ান ক্ষমতা দখল করল...'

বক্তৃতা শুনে তো তার স্ত্রী হেসে খুন, কিন্তু সে কিছু মনে করে না— রাগ করার আগেই ঘুমে ঢলে পড়ে। তার সিল্কের মতো কোমল গোঁফজোড়া নিয়ে কিছুক্ষণ খেলে শিশুকন্যাটি গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে পড়ে। আমি কিন্তু মেয়েটির পরম বন্ধু হয়ে উঠি। রক্ত-লোলুপ ক্ষমতা-দখলকারী এবং তার হতভাগ্য জোসেফিনের উপরে বোলেস্লাভের বক্তৃতার চেয়েও অনেক বেশী করে যখন আমি তাকে গল্পটা শোনাই, সে বেশ উপভোগ করে। আমার সাফল্যে বোলেস্লাভ অদ্ভুত রকম ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে।

"আমার আপত্তি আছে, পেশকভ! জীবনের সংস্পর্শে আসার আগে শিশুকে অবশ্যই জীবনের মূল লক্ষ্যগুলো সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে। দুর্ভাগ্য যে তুমি ইংরিজি জানো না, জানলে 'শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য...' বইটি পড়তে পারতে।"

আমার সন্দেহ, সে ইংরিজির কেবলমাত্র একটি শব্দই জানে, 'গুড বাই'।

সে বয়সে আমার দ্বিগুণ অথচ ছোট্ট পোষা কুকুরের মতোই তার অনুসন্ধিৎসা। সে আড্ডা মারতে ভালবাসত, আর ভালবাসত লোকের মনে এমন একটা ধারণা জন্মাতে যে সে বিদেশ ও রাশিয়ার সমস্ত বিপ্লবী দলের গোপন খবরই রাখে। হয়ত সে তাদের চেনেও বা, কারণ সবসময়ই তার কাছে অদ্ভুত সব অচেনা লোকজন আসত। আর তারা এমন ভাব-ভঙ্গি করত, যে মনে হত তারা এক একজন মহান ট্রাজেডিয়ান কিন্তু বর্তমানে বাধ্য হয়ে বোকা সেজে থাকছে। তার বাড়িতেই আমি বিপ্লবী সাবুনায়েভকে দেখতে পেয়েছিলাম। পুলিশের থেকে আত্মগোপন করার জন্য সে পরত বেখাপ্পা ধরনের লাল রংয়ের পরচুলা এবং তার রঙচঙে স্যুটটা হাস্যকরভাবে গায়ে এঁটে থাকত!

একদিন সেখানে পৌঁছে একজন খুবে গর্বোদ্ধত লোককে দেখতে পেলাম। লোকটার মাথা ছোট এবং দেখতে নাপিতের মতো। পরণে

ছিল চেককাটা প্যান্ট, ধুসর রংয়ের জ্যাকেট এবং মচমচে জুতো। বোলেস্লাভ আমাকে ধাক্কা দিয়ে রান্না ঘরে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলেছিল :

'খুব জরুরী খবর নিয়ে লোকটা এইমাত্র প্যারিস থেকে এসেছে। তাকে কোরোলেঙ্কোর সাথে দেখা করতে হবে ; একটু ব্যবস্থা করে দাও ভাই।'

আমি চেষ্টা করেছিলাম। ফল হয়েছিল এই যে কোরোলেঙ্কোকে রাস্তায় ধরে যখন লোকটিকে চিহ্নিত করে তার উদ্দেশ্য বলেছিলাম, তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় আমাকে বলেছিলেন :

'না না। ধন্যবাদ। ঐ আত্মম্ভর লোকটার সাথে আমার কোন দরকার থাকতে পারে না।'

বোলেস্লাভ এটাকে সেই প্যারিসবাসী ও 'আদর্শের' প্রতি অপমান হিসাবেই দেখেছিল। পরের দু দিন সে কোরোলেঙ্কোর কাছে প্রতিবাদপত্র লিখতেই কাটিয়ে দিল, একবার সক্রোধ নিন্দামিশ্রিত ভাষায়, একবার বিনম্র ধমকের সুরে, এবং সবশেষে চিঠি লেখার সমস্ত প্রচেষ্টাই উনুনে পাঠিয়ে ক্ষান্ত হল। এর ঠিক পরেই মস্কো, নিজ্‌নি নভগোরড, এবং ভ্লাডিমিরে একের পর এক গ্রেপ্তার শুরু হয়। খবরে প্রকাশ যে ঐ চেককাটা ফুলপ্যান্ট-পরিহিত লোকটিই বিখ্যাত ল্যান্ডেজেন গারটিং। সেই প্রথম আমি পুলিশের চর প্রত্যক্ষ করলাম।

কিন্তু সবকিছু মিলিয়ে, আমার প্রেয়সীর স্বামীটি ভাল মানুষ, কিছুটা অভিমানী এবং 'বিজ্ঞানের বুলির' বোঝায় কিছুটা হাস্যকর। সে নিজেই বলে :

'বুদ্ধিজীবীর বেঁচে থাকার একমাত্র যুক্তি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সঞ্চয় করা এবং ব্যক্তিগত লাভালাভির কথা চিন্তা না করে সেই জ্ঞান জনগণের মধ্যে বিলি করা।'

ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে আমার হৃদয়ের টানাপোড়েনও বাড়তে থাকে। সেই নীচের-তলার ঘরে বসে যখনই দেখি যে আমার প্রেয়সী তার কাজের টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়েছে, একটা অদম্য ইচ্ছা আমায় পেয়ে বসে। ইচ্ছা করে তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিই এবং এই বড় ডবল-বেড খাট, পুরোনো আমলের ভারী ডিভান যার উপরে বাচ্চাটা ঘুমায়, ধুলো-জমা বই ও

কাগজপত্তর-বোঝাই টেবিল দিয়ে ঠাসা এই জঘন্য ঘর থেকে তাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাই। জানলা দিয়ে মাঝেই মাঝেই লোকজনের পা বিশ্রীভাবে নজরে পড়ে, একটা রাস্তার কুকুর প্রায়ই সেখান দিয়ে মুখ গলায়; বাতাসে রৌদ্রতপ্ত ধুলোর পূতিগন্ধ ভেসে আসে। ঘরের ভিতরের দৃশ্যটা হচ্ছে এই রকম—গুমোট বাতাস, টেবিলের সামনে একটি কিশোরী-প্রতীম শরীর, তার আনমনা গান, তার পেন বা পেন্সিলের আঁচড়ের শব্দ, ঝুমকা ফুলের মতো নীল চোখের হাসি যা শুধু আমারই জন্য মুহূর্তের তরে উত্তোলিত হয়…। আমি তাকে উন্মাদের মতো ভালবাসতে শুরু করি—তার দুঃখে ভারাক্রান্ত হই।

'নিজের সম্পর্কে আরও কিছু বল,' সে একদিন আমায় বলল।

আমি বলতে শুরু করার কয়েক মুহূর্ত পরেই সে বুঝতে পেরে আমায় থামিয়ে দিল:

'নিজের সম্পর্কে বলছ না কিন্তু।'

খুব ভালভাবেই জানতাম যে নিজের সম্পর্কে বলছি না, বলছি এমন একজনের সম্পর্কে যাকে আমি নিজের সাথে গুলিয়ে ফেলেছি।

বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা ও অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে তখনও নিজের প্রকৃতি সত্তাটিকে আমি খুঁজে পাই নি। তখনও সেটা খুঁজে দেখতে অপরাগ ছিলাম, কিংবা ভয়ই পেতাম। আমি কে, কি আমি? এই প্রশ্নটা আমায় সর্বক্ষণ বিভ্রান্ত করত।

আমি হয়ে উঠেছিলাম জীবন-বিমুখ; আর তাই একবার আত্মহত্যা করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টাও গ্রহণ করেছিলাম। আমি মানুষের বুঝতে পারি না, যে-জীবন তারা যাপন করে মনে হয় তা একঘেঁয়ে জঘন্য অর্থহীন। সযত্নলালিত কৌতূহলের বশেই জীবনের সমস্ত অন্ধ গলি-ঘুঁপচির মধ্যে, সমস্ত রহস্যের মধ্যে উঁকি মেরেছিলাম। এমনও সময় ছিল যখন নিছক কৌতূহলবশেই অপরাধ করতে পারতাম—খুন করলে কেমন লাগে শুধু এইটুকু জানবার জন্যই খুন করতে পারতাম।

ভয় হয়, আমার প্রকৃত সত্তাটি তুলে ধরলে আমার প্রিয়তমার সামনে এমনই এক ছন্নছাড়া ব্যক্তির রূপ প্রকাশ পাবে যার চিন্তাধারা ও অনুভূতি

অস্ভুত—সে এমনই এক পিশাচ যে তার মনে ভীতি সৃষ্টি করবে, তাকে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেবে। নিজের ব্যাপারে আমাকে কিছু একটা করতেই হবে। আমি নিশ্চিত সেই আমায় সাহায্য করতে পারে। একমাত্র সেই পারে আমায় মন্ত্রমুগ্ধ করে পারিপার্শ্বিক জীবন সম্পর্কে আমার এই বিকৃত ধারনার পরিসমাপ্তি ঘটাতে। আর তখনই আমার জীবন ও আত্মা অভূতপূর্ব শক্তি ও আনন্দের বহ্নিশিখায় বিস্ফোরিত হবে।

অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সে নিজের কথা বলত, আর অন্যদের কাছ থেকে সবসময়ই দূরত্বের ব্যবধান রেখে চলত। এ থেকেই আমার ধারণা হয়েছিল যে সে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারীনী, তার হাতেই রয়েছে জীবনের সকল রহস্যের চাবিকাঠি আর তাই সে এত প্রাণোচ্ছল, এত আত্ম-বিশ্বাসে ভরপুর।

তার যে সত্তা আমার কাছে কম উন্মোচিত ছিল, সেই টানেই আমি তাকে ভালবেসেছিলাম। কিন্তু এ কথা ঠিক যে যৌবনের পূর্ণ উদ্দাম ও কামনা নিয়েই তাকে ভালবেসেছিলাম। যে কামনার আগুনে জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছিলাম, তা অবদমিত রাখতে আমি তীব্র মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকি। অপেক্ষাকৃত সহজ, স্থূলভাবে ব্যাপারটা ঘটালে হয়ত সে যন্ত্রণার লাঘব ঘটত। কিন্তু নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিছক দৈহিক মিলনের উর্ধ্বে মহৎ কিছু বলেই আমার বিশ্বাস। দৈহিক মিলন বলতে পাশবিক আচরণই বুঝতাম। যদিও, আমি শক্তসমর্থ ও যথেষ্ট অনুভূতিপ্রবণ যুবক এবং আমার কল্পনাশক্তি সহজেই প্রজ্বলিত হত, এই পাশবিক আচরণ আমার মনে ঘৃণার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত।

কিভাবে যে এই রোমাণ্টিক স্বপ্নে মশগুল হয়ে গেলাম বলতে পারব না। কিন্তু আমার জ্ঞানের সীমার বহির্ভূতে কোন একটি বস্তুর প্রতিই যেন আমার ছিল অটল বিশ্বাস।

সেই বস্তুটির মধ্যেই ছিল নারী-পুরুষ সম্পর্কের মহিমান্বিত ও রহস্যময় অর্থটি—যা মহৎ, আনন্দময় অথচ ভয়ংকর, যা প্রথম আলিঙ্গনের মধ্যে প্রকাশ পায়। এবং আমার বিশ্বাস এই পরম আনন্দের নির্মল অভিজ্ঞতা যে কোন মানুষকে চিরতরে রূপান্তরিত করে দেবে।

আমার ধারণা, পুঁথির জ্ঞান থেকে আমার এইসব অদ্ভুত কল্পনা আসেনি।

বিদ্রোহচারী হবার জন্যই এসব নিয়ে চর্চা করেছি, কারণ আমিই আমার প্রথম পর্বের একটি কবিতায় লিখেছিলাম, 'মানব না বলেই এই পৃথিবীতে এসেছি।'

উপরন্তু আমার ছিল অদ্ভুত ও পীড়াদায়ক এক স্মৃতি: এই বাস্তব বহির্ভূত এক জগতে, আমার জীবনের কোন আদিতম মুহূর্তে এক মহান আধ্যাত্মিক উত্তেজনা, এক সুমধুর চাঞ্চল্যের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম, যা বলা চলে ঐকতানের পূর্বাস্বাদ লাভ করেছিলাম—তা এমনই এক আনন্দ যা প্রথম সূর্যোদয়ের চেয়েও উজ্জ্বল। সম্ভবতঃ আমি যখন মায়ের গর্ভে ছিলাম তখন মা যে পরম আনন্দের স্বপ্ন অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল তা আমার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। আর তা থেকেই আমার আত্মার জন্ম, জীবনশিখার প্রজ্বলন। আর সম্ভবতঃ মায়ের ভাবাবেশের সেই হর্ষবিহ্বল মুহূর্তটি থেকেই আমার মধ্যে এই অদ্ভুত ও অস্থির প্রত্যাশা বিরাজ করছে যে নারীর মধ্যে আমি নিশ্চয়ই কিছু অসাধারণত্বের পরিচয় পাবো।

মানুষ যা জানেনা, তা নিয়ে কল্পনা করে। তার জানা অভ্যাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম হল নারীকে ভালবাসা ও তার রূপের পূজা করা।

একদিন নদীতে স্নান করতে গিয়ে একটা বজরার পেছন থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলাম। ফলে বুকে নোঙরের শেকলের আঘাত লেগেছিল এবং তাতে পা আটকে যাওয়ায় জলের মধ্যে নীচের দিকে মাথা করে আমি ঝুলছিলাম। অবশেষে একজন গাড়োয়ান এসে আমায় টেনে তোলে। লোকেরা আমার শরীর নিয়ে বিচ্ছিরিভাবে দলাই-মলাই ক'রে পেট থেকে জল বার করে। আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি, রক্তবমি করি এবং শয্যাশায়ী হই ও বরফ খেয়ে কাটাতে হয়।

আমার প্রেয়সী দেখা করতে আসে। সে আমার বিছানায় বসে জিজ্ঞেস করেছিল কিভাবে ব্যাপারটা ঘটেছিল। কালো অস্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সে তার নরম স্নিগ্ধ হাত কপালে বুলিয়ে দিচ্ছিল।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম সে কি বোঝে না আমি তাকে ভালবাসি।

সে সচেতনভাবে হেসে বলল, 'হ্যাঁ, তা বুঝি। কিন্তু ব্যাপারটা খুবই খারাপ—অবশ্য আমিও তোমায় ভালবাসি।'

তার স্বীকারোক্তিতে পৃথিবী দুলে উঠল এবং আশপাশের বাদ-বাকিদার গাছ-পালা খুশীতে দুলতে লাগল। আমি ভাবাবেগ ও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম ; তার কোলে মাথা গুঁজে দিলাম। যদি তাকে শক্ত করে আঁকড়ে না ধরতাম, নিশ্চয়ই আমি সাবানের বুদবুদের মতো জানলা দিয়ে ভেসে বেরিয়ে যেতাম।

'নড়াচড়া করো না, খারাপ হবে,' মাথাটা বালিশে বসিয়ে দিতে দিতে সে কঠিন স্বরে কথাটা বলল। 'তুমি শান্ত না হলে বাড়ি চলে যাবো কিন্তু। কি পাগল ছেলেরে বাবা! তোমার মতো ছেলে আমি জীবনে দেখিনি। ভালো হয়ে ওঠো, তখন এইসব কথা, এইসব অনুভূতি নিয়ে আলোচনা হবে।'

সে সম্পূর্ণ সংযমের সাথে কথা বলল, তার উজ্জ্বল চোখের হাসি ছিল অবর্ণনীয় কোমল। সামান্য কিছুক্ষণ পরেই সে চলে গেল। আমি আশায় উদ্দীপ্ত হলাম এবং বিশ্বাসে বুক ভরে উঠল যে তার সাহায্য পেলে আমি নতুন চিন্তা ও অনুভূতির রাজ্যের সর্বোচ্চ শিখরে উঠতে পারব।

কয়েকদিন পরের কথা। আমরা শহরের বাইরে একটি গিরিখাতের পাদদেশে একটি মাঠের উপরে বসে আছি। নীচে বাতাসের ঝাপটায় গাছপালা মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। ধূসর মেঘলা আকাশে বৃষ্টির ইঙ্গিত। নিরস, ভাবাবেগহীন ভাষায় সে আমায় আমাদের বয়সের পার্থক্যের কথা বলল। সে বলল আমার পড়াশুনা শুরু করতে হবে আর এত তাড়াতাড়ি আমার স্ত্রী ও সন্তানের বোঝা নেওয়া ঠিক নয়। সন্তানের কাছে মা যে-ভাষায় কথা বলে সেই ভাষায় বলা এই বেদনাদায়ক সত্যকথাগুলি কেবল তার প্রতি আমার ভালবাসা ও শ্রদ্ধাই বাড়িয়ে তুলল। তার গলার স্বর ও কোমল কথাগুলো শুনতে যেমন বিষণ্ণ, তেমনি মিষ্টি। আগে কেউ আমার সাথে এইভাবে কথা বলেনি।

আমি নীচের বিস্তৃত গিরিখাতের দিকে তাকালাম। বাতাসের ঝাপটায় ঝোপগুলোকে মনে হচ্ছে কোন খরস্রোতা সবুজ নদী। আমি অন্তরের অন্তস্থলে প্রতিজ্ঞা করলাম, সে তার সম্পূর্ণ হৃদয়কে উজাড় করে আমায় যে স্নেহ ঢেলে দিয়েছে, আমি তার প্রতিদান দেব।

'কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমাদের উচিত খুব ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করা।' আমি তার নরম কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। সে বসে বসে সবুজ বাগানে ঢাকা শহরের দিকে তাকিয়ে, একটা শক্ত গাছের ডাল দিয়ে নিজের হাঁটুর উপরে মৃদু আঘাত করতে লাগল।

'এবং স্বাভাবিকভাবেই আমাকে বোলেস্লাভের সাথে কথা বলতে হবে। ওর সন্দেহ শুরু হয়েছে এবং অস্থির হয়ে পড়েছে। কোন নাটকীয়তা আমার ভালো লাগে না।'

সমস্ত বিষয়টাই খুব করুণ ও সুন্দর। কিন্তু ব্যাপারটাতে কিছু হাস্যকর, বিকৃতিও দেখা দিল।

আমার প্যান্টের কোমরটা খুবই ঢিলা। ইঞ্চি তিনেক লম্বা একটা পেতলের কাঁটা দিয়ে কোমরটা ছোট করেছি (এই ধরণের কাঁটা এখন আর তৈরী হয়না, সৌভাগ্যবশতঃ, কপর্দকশূন্য প্রেমিকদের জন্য)। কাঁটাটা শরীরে খোঁচা মারছিল! আর একবার, একটু অসতর্কতার সাথে নড়াচড়া করায়, কাঁটাটা একপাশে গেঁথে গেল। কোন মতে সেটা টেনে বার করে ফেললাম। কিন্তু কি ভয়ংকর! ক্ষত দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে প্যান্টটা ভিজিয়ে দিল। কোন আন্ডারওয়্যার পরিনি, বাবুর্চির জ্যাকেটটাও যে কোমর অবধি লম্বা। ভেজা প্যান্টটা তো পায়ের সঙ্গে লেপ্টে গেছে, এ অবস্থায় কিভাবে আমি উঠে যাই?

এ রকম একটা অদ্ভুত দুর্ঘটনায়, হাস্যকর অবস্থায় জড়িয়ে আমি রেগে উঠলাম। অভিনেতা তার পার্ট ভুলে গেলে যেমন অস্বাভাবিক গলায় অভিনয় চালিয়ে যায় তেমনি আমি উত্তেজিত গলায় কথা বলতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ সে আমার কথা শুনল, প্রথমে মনোযোগ দিয়ে, তারপরে স্বাভাবিকভাবেই বিচলিত হয়ে।

'কি সব বড় বড় কথা!' সে বলল। 'মনেই হচ্ছে না তুমি কথা বলছ।'

আমি শেষ কৌশল অবলম্বন করেছিলাম; আর এখন শামুকের মতো কুঁকড়ে গেলাম।

'চল বাড়ি যাই, বৃষ্টি হবে।'

'আমি এখানেই থাকব।'

'কেন ?'

কি উত্তর দেব ?

কোমলভাবে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমার উপরে রাগ করেছ ?'

'না না ! নিজের উপর রাগ করেছি ।'

'নিজের উপরেও রাগ করা উচিত নয় ।' এই কথা বলে সে উঠে পড়ল ।

আমি নড়তে পারলাম না । সেই উক্ত কর্মমাত্র অবস্থায় বসে থেকে কল্পনা করলাম যে রক্তক্ষরণের শব্দ হচ্ছে এবং সে তা শুনতে পেয়েছে । আর সে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসছে :

'ও কিসের শব্দ ?'

'তুমি চলে যাও ।' আমি মনে মনে তাকে মিনতিভরে বললাম ।

সে উদারভাবে আরও কয়েকটা কোমল কথা বলল, তারপর ঘুরে গিরিপথের ধার ঘেঁসে চলে যেতে লাগল । সে মনোরম ভঙ্গিতে চরণের ছন্দলালিত্যে দুলে দুলে চলতে লাগল । আমি তার অপসৃয়মান তন্বী দেহের দিকে তাকিয়ে রইলাম—ক্রমে সে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল । তারপর মাটিতে আছড়ে পড়লাম । আমি নিশ্চিত আমার প্রথম প্রেম অসুখী হয়ে উঠবে ।

আর হ'লও তাই । তার স্বামী অশ্রুপাত করল, বিড়বিড় করে অনেক আবেগভরা প্রলাপ বকল আর সে নিজেও সেই চিটেগুড়ের-স্রোতা সাঁতরে আমার দিকে আসবার জন্য মন স্থির করে উঠতে পারল না ।

অশ্রুভরা চোখে সে আমায় বলল, 'সে বেচারা অসহায় আর তুমি তো শক্তিশালী । ও বলে, আমি তাকে ছেড়ে গেলে সে রোদহীন ফুলের মতো শুকিয়ে যাবে··· ।'

আমি ফুল-উপমেয় ব্যক্তিটির মোটা-খাটো পা, রমণীসদৃশ নিতম্ব এবং খরমুজের মতো পেটের কথা স্মরণ করে হো হো করে হেসে উঠলাম । ওর দাড়িতে মাছি বসে—কারণ সবসময়ই সেখানে খাদ্য থাকে ।

সে হাসল ।

স্বীকার করল, 'কথাগুলো শুনলে সত্যি হাসি পায়, কিন্তু ও সত্যিই

খুব আঘাত পেয়েছে।'

'আমিও পেয়েছি।'

'উঃ! কিন্তু তুমি যুবক, ক্ষমতাবান।'

জীবনে এই প্রথম অনুভব করলাম আমি দুর্বলের শত্রু। পরবর্তী কালে প্রায়ই দেখেছি যে, এর চেয়েও কোন দুঃস্বপ্নপূর্ণ পরিবেশে দুর্বলদের দ্বারা পরিবৃত সবলেরা কত করুণভাবেই না অসহায়। আর প্রকৃতি যেসব অপ্রয়োজনীয় প্রাণীকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায় তাদের বাঁচিয়ে রাখতে শরীর ও মনের কত মূল্যবান শক্তিরই অপচয় হচ্ছে।

সেই ঘটনার ঠিক পরেই, অসুস্থ শরীর নিয়ে আমি প্রায় উন্মাদের মতো শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি এবং প্রায় দু বছর রাশিয়ার পথে পথে ঘুরে বেড়াই। ভল্গা ও ডন নদীর উপত্যকাগুলো পার হয়ে যাই; ইউক্রেন, ক্রিমিয়া ও ককেসাসের মধ্যে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াই, অসংখ্য দৃশ্যপট আয়ত্ত করি এবং স্বভাবে অনেক বেশী রুক্ষ ও উদ্ধত হয়ে উঠি। তবুও হৃদয়ের অন্তস্থলে আমি সেই নারীরই প্রতিমূর্তিটি সযত্নে ধারণ করে রেখেছিলাম—যদিও তার চেয়ে অনেক ভাল, অনেক বুদ্ধিমতী নারীর সংস্পর্শে আমি এসেছি।

এবং বছর দুয়েকের কিছু পরে শরৎকালে কোন একদিন তিফলিসে যখন শুনলাম সে আবার প্যারিস থেকে ফিরে এসেছে এবং আমার এই শহরে থাকার সংবাদে খুশী হয়েছে, জীবনে সেই প্রথম আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম, অথচ তখন আমি মাত্র তেইশ বছরের শক্ত সমর্থ যুবক।

তার এক বন্ধুর মারফৎ আমন্ত্রণ না জানালে সম্ভবতঃ আমি তার সাথে দেখা করার সাহস পেতাম না।

তাকে আগের চেয়ে অনেক বেশী মনোহরী, অনেক বেশী আকর্ষণীয়া মনে হচ্ছিল। আগের মতোই তার ছিল সেই কিশোরী-প্রতিম দেহ, সুচারু গায়ের রঙ, নীল চোখের কোমল জ্যোতি। স্বামীটি তার ফ্রান্সেই রয়ে গেছে, সে একা এসেছে তার মেয়েকে নিয়ে। মেয়েটি হয়েছে হরিণীর মতো প্রাণোচ্ছল ও মাধুরী-মাখানো।

প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি-বজ্র মাথায় নিয়ে আমি তার সাথে দেখা করতে

গিয়েছিলাম ; মুষলধারায় বৃষ্টির শব্দে বাতাস ছিল মুখর, বর্ষার জলধারা সেন্ট ভোঁভঙ পাহাড়ের গা বেয়ে এত তীব্রভাবে ছুটে আসছিল যে রাস্তার ইট-পাথর ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছিল। বাতাসের গর্জন, জলের ঝাপটা, ধ্বংস ও ভাঙনের নিনাদে বাড়িটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। জানলার শার্সিগুলো ঝনঝন করছিল, নীল আলোর ঝলকানিতে ঘরটা মুহুর্মুহু উদ্ভাসিত হচ্ছিল, এবং সমস্ত কিছুই যেন অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছিল।

ভীত-সন্ত্রস্ত শিশুটি বিছানার চাদরের মধ্যে মুখ লুকিয়েছে ; বিদ্যুতের ঝলকানিতে চোখে ধাঁধা নিয়ে আমরা জানলার পাশে দাঁড়িয়ে আছি, আর কেন জানি না, ফিসফিস করে নীচু গলায় কথা বলছি।

'এমন প্রচণ্ড ঝড় আগে দেখিনি,' আমার প্রেয়সী বলে উঠল।

হঠাৎ সে আমায় প্রশ্ন করে বসে, 'আমার কথা ভুলে গেছ তো ?'

'না।'

বিস্ময়ে, একইভাবে ফিসফিস করে সে বলল, 'কি আশ্চর্য', কি রকম পাল্টে গেছ। তুমি সম্পূর্ণ ভিন্ন-মানুষ।'

জানলার পাশে আর্মচেয়ারটায় সে ধীরে ধীরে বসে পড়ল। অত্যন্ত উজ্জ্বল এক অশনি-সংকেতে চমকে উঠে ভুরু কুঁচকে বলল :

'তোমার সম্পর্কে অনেক কথা শুনতে পেলাম। এখানে কি করতে আছ ? বল, তোমার খবর কি।'

হে ভগবান ! কি ছোট্ট, অথচ কি বিস্ময়কর এই নারী !

আমি মধ্যরাত পর্যন্ত বকবক করে গেলাম, এ যেন তার কাছে আমার স্বীকারোক্তি। প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা চিরকালই আমাকে উত্তেজিত, উদ্দাম উৎসাহী করে। যেরকম একাগ্রচিত্তে সে আমার কথা শুনছিল এবং যেরকম বিস্ফারিত চোখে, অপলক দৃষ্টিতে আমায় দেখছিল, মনে হয়েছে আমি নিশ্চয়ই খুব ভাল কথা বলেছি।

'সত্যিই কি ভয়ংকর !'

বিদায় নিতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম, 'বিদায়' কথাটা বলার সময় তার মুখে আর কনিষ্ঠের প্রতি বয়োজ্যেষ্ঠের উৎসাহব্যঞ্জক হাসিটি নেই—আগে তার এই রকম হাসি আমাকে সর্বদাই বিব্রত করে এসেছে। আমি ভেজা-রাস্তা দিয়ে

হেঁটে চলেছি আর লক্ষ্য করছি ধারালো কাস্তের মতো চাঁদটা কিভাবে মেঘগুলোকে কেটে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে; আনন্দ ও খুশীতে আমার মন তখন পরিপূর্ণ। পরের দিন আমি তাকে তার কাছে এই কবিতাটা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম (পরবর্তীকালে সে কবিতাটা এতবার আবৃত্তি করেছিল যে সেটা আমার মনে গেঁথে গেছে):

হে আমার মহীয়সী নারী!
একটি মধুর কথা, একটু স্নিগ্ধ চাউনিতে
সহজেই তোমার অনুগত দাস হবে এই আমি(?)কের—
যার শিল্প-দক্ষতায় ক্ষুদ্র, তুচ্ছ বস্তু রূপান্তরিত হবে
ছোট ছোট আনন্দের ঢেউয়ে।

এই অনুগত দাসটিকে কাছে টেনে নাও।
হয়ত বা এই ছোট ছোট আনন্দের ঢেউগুলোকেই
সে রূপ দেবে মহা-আনন্দের স্রোতে।
এই বিশ্ব কি গড়ে ওঠেনি ছোট ছোট বস্তুকণা দিয়ে?

আমি তোমায় দেব এনে দুর্লভ ও ক্ষুদ্র আনন্দের এক জগত;
আর তারও রয়েছে একটি করুণ দিক:
যেমন, একদিকে তোমার এই অনুগত দাস:
তেমনি একটি সুমধুর দিকও আছে:
কে আছে তোমার চেয়ে মধুর?

কিন্তু একটু অপেক্ষা কর!

শব্দের ভোঁতা নখের ডগায়
তোমার স্বর্গীয় মাধুরীকে যাবে কি ধরা—
যে তুমি এই পৃথিবীর
কতিপয় সুন্দরতম ফুলের চেয়েও শ্রেয়?

অবশ্য এটাকে কবিতা আখ্যা দেওয়া যায় না, কিন্তু যথেষ্ট নিষ্ঠার সাথেই এটা লেখা হয়েছিল।

এবং এই আমি, এখন এই পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্যজনক এক ব্যক্তির মুখোমুখী বসে আছি—একে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না। সে একটা

নীল রঙের গাউন পরে আছে। গাউনটা এমন ঢোলাঢালাভাবে তার শরীরে ঢেউ খেলে গেছে যে তার দেহের কোন প্রান্ত রেখাকেই আড়াল করেনি। সে তার বেল্টের সুতো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে যেসব কথা বলছে তা আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। আমি তার সরু সরু আঙুলের নাড়াচাড়া দেখছি। আঙুলের শেষ প্রান্তে রয়েছে গোলাপী নখ। মনে হচ্ছে আমি যেন একটি বেহালা—কোন এক দক্ষ ও প্রিয় বাদক তাকে সুরে বাঁধছে। আমি মরতে চাই, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ভেতর দিয়ে এই নারীকে আমার হৃদয়ের মধ্যে পেতে চাই যাতে সে চিরকাল আমারই থাকে। আমার শরীর শক্ত হয়ে উঠছে, উত্তেজনায় মন্তপাক্লিষ্ট হয়ে পড়ছে এবং মনে হচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

আমি আমার প্রথম গল্পটা তাকে পড়ে শোনালাম (গল্পটা সদ্য-প্রকাশিত), কিন্তু মনে নেই, গল্পটা সম্পর্কে সে কি মন্তব্য করেছিল। মনে হচ্ছে সে যেন বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিল :

'অর্থাৎ তুমি শেষ পর্যন্ত গদ্য লেখকে পরিণত হলে!' এবং তারপরই স্বপ্নাবেশের মতো সে বলেছিল, 'এই দু বছরে তোমাকে নিয়ে আমি কত কিই না ভেবেছি। এটা কি ঠিক যে আমার জন্যই তুমি এইসব কষ্ট স্বীকার করেছ?'

আমি বিড়বিড় করে যেন বললাম, যে-ভুবনে সে বিরাজ করে সেখানে কষ্ট বলে কোন কিছু নেই।

'তুমি কি সুন্দর…!'

আমার আকুল কামনা হচ্ছে তাকে আলিঙ্গন করার, কিন্তু এমন অদ্ভুত দীর্ঘ বাহু ও বিশাল হাত আমার যে তাকে স্পর্শ করার সাহস পেলাম না—আমার ভয় সে হয়ত আঘাত পাবে। এবং আমি উঠে দাঁড়ালাম, দ্রুত হৃৎস্পন্দনের তালে দুলে দুলে ফিসফিস করে বলে ফেললাম :

'এস, আমার সাথে ঘর বাঁধো; আমি মিনতি করছি, আমার সাথে ঘর বাঁধো!'

কিঞ্চিৎ বিহ্বলতায় সে মৃদু হাসল আর তার প্রিয় চোখজোড়া অদ্ভুতরকম উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঘরের এক কোণায় উঠে গিয়ে বলে উঠল :

'হ্যাঁ আমরা তাই করব। তুমি নিব্‌নি নভগোরডে ফিরে যাও। আমি এখানেই ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবি; তারপর চিঠি দিয়ে জানাবো।'

পূর্বে-পড়া কোন এক উপন্যাসের নায়কের মতো কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করে আমি যেন বাতাসের উপর দিয়ে হেঁটে চলে এলাম।

সেই শীতে, সে ও তার কন্যা, নিব্‌নি নভগোরডে আমার কাছে চলে এল।

'দরিদ্রের বিবাহোত্তর রাতগুলোও ছোট,' এটা হল একটা রুশী প্রবাদের করুণ মর্মকথা। আমার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েও প্রবাদটির সত্যতা বুঝতে পেরেছিলাম।

মাসে দু রুবল দিয়ে আমরা একটা পুরো বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলাম—বাড়িটা একজন যাজকের বাড়ির পশ্চাদ্ভাগের একটি স্নানাগার। আমি প্রবেশপথটি দখল করলাম এবং আমার স্ত্রী নিল স্নানঘরটি—এ ঘরটা আমরা ড্রইংরুম হিসেবেও ব্যবহার করতাম। বাড়িটা আদৌ বসবাসের যোগ্য নয়—আনাচে-কানাচে, কার্ণিসে বরফ জমে। বেশীরভাগ সময়ে আমি রাতেই কাজ করি। যত জামাকাপড় আছে সব চাপিয়ে তার উপরে একটা কার্পেট বিছিয়ে দিতাম এবং তৎসত্ত্বেও আমার বিচ্ছিরিরকম বাতে ধরল—ব্যাপারটা খুবেই অপ্রত্যাশিত, বিশেষ করে সেই সময়ে যখন কঠোর পরিশ্রমের জন্য আমি গর্ব করতাম।

স্নানঘরটা বেশ উষ্ণ, কিন্তু চুল্লীতে আগুন জ্বালালেই ঘরগুলো সাবান, সেদ্ধ বার্চপাতা ও পচা কাঠের দুর্গন্ধে ভরে উঠত। ফলে ছোট্ট মেয়েটা (সুন্দর চোখের পোর্সিলিনের পুতুল) ঘাবড়ে যেত ও তার মাথা ব্যথা করত।

বসন্তকালে মাকড়সা ও কাঠ-পিঁপড়ে এই স্নানঘরে এসে বাসা বাঁধত। মা আর মেয়ে তো ঐ সব দেখামাত্র প্রায় অজ্ঞানই হয়ে পড়ে, আর আমাকে জুতোর শুকতলা দিয়ে ওগুলো পিটিয়ে মারতে হয়। জংলা ফুলগাছের ঝোপ আমাদের ছোট ছোট জানলা ছাড়িয়ে বেড়ে উঠেছে, ফলে ঘরগুলোতে সবসময়ই আবছা-আলো আবছা-অন্ধকার। কিন্তু মাতাল ও খামখেয়ালী

যাজক লোকগুলোকে উপড়ে ফেলতে বা হেঁটে ফেলতে দিত না।

অবশ্যই এর চেয়ে ভাল বাসা পেতাম, কিন্তু আমরা সেই যাজকের কাছে কিছু অর্থের ঋণে আবদ্ধ ছিলাম। আর সে আমায় এতই পছন্দ করত যে আমায় যেতে দিত না।

সে বলত, 'কিছুদিন থাকলেই অভ্যেস হয়ে যাবে। আর যদি না হয়, টাকা ফেরৎ দিয়ে যেখানে খুশী কেটে পড়—যদি চাও তো ইংরেজদের কাছে গিয়েও থাকতে পার, তাতে আমার কিছু যায় আসে না।'

সে ইংরেজদের খুব ঘৃণা করত এবং বেশ জোর দিয়েই বলত, 'একটা কুঁড়ের জাত, এক তাস খেলা ছাড়া তারা কখনই কিছু আবিষ্কার করেনি আর লড়াই কাকে বলে সে তো জানেই না।'

লোকটা দৈত্যের মতো, লাল গোল মুখ ও বেশ লম্বা লাল দাড়ি, আর এমন মদ খেত যে চার্চের কাজকর্ম দেখাশুনা করতে পারত না। একটি খুদে, উন্নত-নাসা, কৃষ্ণকেশী দর্জি-মেয়ের প্রেমে খুব হাবুডুবু খেয়েছিল—মেয়েটি ছিল দাঁড়কাকের মতো।

মেয়েটি তাকে কিভাবে বশ করেছে এই কথা বলতে গিয়ে টোকা দিয়ে দাড়ি থেকে চোখের জল ঝেড়ে বলত :

'ও যে একটা রাক্ষুসী তা জানি। কিন্তু ওকে দেখলে শহীদ কিমিরামার কথা মনে পড়ে যায়, আর তাই আমি ওকে ভালবাসি।'

'সাধু-সন্তদের জীবনী' গ্রন্থে সেই বিশেষ শহীদের খোঁজ করেছি, কিন্তু তেমন কোন শহীদ নারীর সন্ধান পাই নি।

আমি তার কথা বিশ্বাস নাও করতে পারি বুঝে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং আমাকে অভিভূত করার চেষ্টা ক'রে বলে : 'ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখার চেষ্টা কর হে খোকা : বিশ্বাসী আছে লক্ষ লক্ষ আর অবিশ্বাসী আছে মাত্র কয়েকজন। কেন বলত? কারণ চার্চবিহীন প্রাণ হচ্ছে জলবিহীন মাছের মতো। বুঝলে? এস এ বিষয়ে একটু মদ খাওয়া যাক।'

'আমি মদ খাই না—বাতে মদ খাওয়া খারাপ।'

কাঁটা-চামচে এক টুকরো হেরিং মাছ গেঁথে সে মাথার উপরে কয়েক পাক ঘোরাল এবং শাসনের সুরে বলল :

'আর তারও কারণ হচ্ছে, তোমার বিশ্বাস নেই।'

আমার প্রেয়সীকে এই স্নানঘরে থাকতে হয়, রাতে খাবার জন্য মাংস কেনার অর্থ নেই বা বাচ্চাটার খেলনা কিনতে পারি না—এই অভিশপ্ত দারিদ্র্যের লজ্জায় আমি রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে কাটাই। দারিদ্র্যের জন্য আমার নিজের কোন লজ্জা নেই। কিন্তু এই ভদ্র বংশজাত, মহীয়সী যুবতী নারীটিকে, এবং বিশেষতঃ তার শিশুকন্যাটিকে এই সব সহ্য করতে হয়—খুবই অপমানকর, খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

রাত্রিবেলা ঘরের কোণে আমার লেখার টেবিলে বসে যখন আইনসংক্রান্ত নথিপত্র কপি করতাম বা গল্প লিখতাম, দাঁত কিড়মিড় করতে করতে আমি নিজেকে, আমার প্রেম, ভালবাসা, ভাগ্য ও জনগণকে সামগ্রিকভাবে অভিসম্পাত দিতাম।

আমার প্রেয়সী একজন মহীয়সী নারী; সে এমনই এক জননী যে তার সন্তানকে বুঝতেই দিত না তার জীবন কত কষ্টের। তার মুখে কখনও কোন অভিযোগ শুনিনি; আমাদের অবস্থা যত কঠোর হয়েছে, তার কণ্ঠস্বর হয়েছে তত প্রাণোচ্ছল, হাসি তত স্বতস্ফূর্ত। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সে যাজক ও তাঁদের মৃত পত্নীদের ছবি আঁকত এবং জেলার ম্যাপ তৈরী করত। কোন এক প্রদর্শনীতে স্থানীয় প্রশাসক এইসব ম্যাপের জন্য স্বর্ণপদক লাভ করেছিল। ছবি আঁকার অর্ডার না থাকলে, সে সিল্ক, খড় ও তারের টুকরো দিয়ে আমাদের পাড়ার মেয়েদের জন্য সৌখীন প্যারিসীয় টুপি তৈরী করত। মেয়েদের টুপির ব্যাপারে আমার কোন ধারণা নেই, তবে তার এইসব অদ্ভুত সৃষ্টিগুলো নিশ্চয়ই খুব মজাদার কারণ সেগুলো মাথায় দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে উচ্চহাসিতে ফেটে পড়ত। আর এইসব টুপি-পরিহিতাদের উপর এর প্রভাবও ছিল খুব অদ্ভুত—তারা, যখন এইসব পাখির-বাসা মাথায় চাপিয়ে রাস্তা দিয়ে গট্‌গট্‌ করে হেঁটে যেত বিশেষ এক গর্বে তাদের পেট সামনের দিকে এগিয়ে আসত।

আমি জনৈক উকিলের কেরাণীর কাজ করতাম এবং স্থানীয় খবরের কাগজের জন্য গল্প লিখতাম—আমার এই সৃষ্টিশীল প্রচেষ্টার জন্য লাইন প্রতি দুই কোপেক করে দক্ষিণা পেতাম। বিকেলে চা-খাওয়ার অতিথি না

এলে, আমার স্ত্রী তার স্কুলজীবনের গল্প বলে আমায় আনন্দ দিত। বোধ-হয় বেলোস্টকের সেই বোর্ডিং-স্কুলে দ্বিতীয় আলেকজান্ডার প্রায়ই বেড়াতে আসতেন। তিনি যুবতীদের মিষ্টি খাওয়াতেন এবং তারই ফলে কোন এক অলৌকিক উপায়ে তাদের কেউ কেউ গর্ভবতী হয়ে পড়ত। আর মাঝে মাঝেই সেরা সুন্দরীদের কেউ না কেউ তাঁর সাথে শিকার করতে বেলোভেজস্কায়ার জঙ্গলে যেত এবং সেখান থেকেই সোজা চলে যেত পিটার্স-বার্গ, বিয়ের জন্য।

সে আমাকে প্যারিস সম্পর্কেও অনেক মজার মজার গল্প বলে; বইপত্তর পড়ে ইতিমধ্যে আমিও এইসব বিষয়ে কিছু কিছু জেনে ফেলেছি, বিশেষ করে ম্যাক্সিম দু ক্যাম্পের লেখা ভারী ভারী বই পড়ে। মন্টমার্ট্রির কাফেগুলো থেকে এবং লাতিন কোয়ার্টারের উদ্দাম জীবনযাত্রার মধ্যে দিয়ে সে প্যারিসকে জেনেছে। তার গল্পগুলো মদের চেয়েও উত্তেজক মনে হত এবং আমি নারীদের রূপ বন্দনা করে কবিতা লিখি—আমার দৃঢ়বিশ্বাস, পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্য তাদের প্রতি ভালবাসার দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছে।

তার নিজের প্রেমের কাহিনী শুনতেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসতাম। সে এমন সম্মোহনী ভঙ্গীতে ও সারল্যের সাথে সেসব বলত, মাঝে মাঝে আমিই লজ্জা বোধ করতাম। হাল্কা পেন্সিলের টানের মতো কথা দিয়ে হাসতে হাসতে সে সেই জেনারেলটির চিত্র তুলে ধরে যার সাথে সে প্রণয়াবদ্ধ ছিল। কোন এক রাজকীয় শিকার-দলে জেনারেলটি জারকে প্রথম সুযোগ না দিয়েই একটি বুনো মোষ গুলি করেছিল, তারপর সেই আহত জন্তুটার কাছে গিয়ে চিৎকার করে বলেছিল: 'হে মহারাজ। ক্ষমা কর!'

সে আমাকে রাশিয়ার রাজনৈতিক দেশান্তরীদের গল্পও বলে, আর যখনই সে এ কাহিনীগুলো বলে আমি তার ঠোঁটে প্রসন্নতার মৃদু হাসি দেখতে পাই। মাঝে মাঝে সে এমন আন্তরিক হয়ে ওঠে যে অত্যন্ত সাদামাটাভাবে সকলেরই নিন্দা করে; বিড়ালের মতো জিভের গোলাপী ডগাটাকে ঠোঁটের উপর বুলিয়ে নেয়, তার চোখে জ্বলে অদ্ভুত আলো; মাঝে মাঝে বিরক্তিও প্রকাশ করে। কিন্তু বেশীরভাগ সময়েই সে যেন পুতুলখেলায়-মত্ত একটি ছোট্ট মেয়ে।

একদিন সে আমায় বলল :

'রাশিয়ানরা প্রেমে পড়লে বড় বেশী বাচাল ও একঘেঁয়ে হয়ে পড়ে— কখনও বা বিরক্তিকর বাক্যবাগীশ। কেবল ফরাসীরাই জানে কিভাবে ভালবাসতে হয়। প্রেম তাদের কাছে প্রায় ধর্মেরই সামিল।'

তারপর থেকেই আমি ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তার সাথে সংযত ব্যবহার করি, তার প্রতি আরও বেশী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করি।

সে ফরাসী মহিলাদের সম্পর্কেও বলত :

'তাদের মন সবসময়ে আন্তরিকভাবে কোমল নয়, কিন্তু পরিবর্তে তারা দেয় সযত্নলালিত যৌনবাসনা। প্রেম তাদের কাছে একটা শিল্প।'

একথা বলার সময় তার কণ্ঠস্বর গম্ভীর ও শিক্ষক-সুলভ হয়ে ওঠে। এইসব জ্ঞান যে আমার খুব বেশী দরকার তা নয়, তবুও তা জ্ঞান, আর আমিও আগ্রহভরে সেই জ্ঞানসুধা পান করি।

কোন এক জ্যোৎস্নারাতে সে বলেছিল, 'রুশ ও ফরাসী মেয়ের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে সম্ভবতঃ ফল ও ফলের গন্ধযুক্ত মিষ্টি সন্দেশের মধ্যেকার তফাতের মতোই।'

সে নিজেও একটি মিষ্টি সন্দেশ। দাম্পত্যজীবনের প্রথম দিকে নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে আমার রোমান্টিক ধারণাগুলো আবেগভরে বলে তাকে খুবই বিস্মিত করেছিলাম।

'তুমি-কি চিন্তা ক'রে বলছ ? সত্যিই তাই মনে কর ?' নীল জ্যোৎস্নায় অবগাহন করে, আমার হাতের উপরে ঢলে পড়ে প্রশ্ন করেছিল। তার পাণ্ডুর দেহের মাংস ছিল স্বচ্ছ, আর শরীর থেকে বেরিয়ে আসছিল কাগজী-বাদামের মিষ্টি গন্ধ। তার সরু সরু আঙুল আমার চুলের মধ্যে আনমনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আর আমার দিকে চঞ্চল আয়ত চোখে তাকিয়ে তার ঠোঁটে খেলছিল এক অবিশ্বাসী হাসি।

'হায় ভগবান!' সে বিস্ময়ে বলে উঠল। মেঝেতে লাফিয়ে নেমে সামনে-পেছনে, আলো-ছায়ার জাফরিতে পায়চারী করতে লাগল। চাঁদের আলোয় তার শুভ্র ত্বক জলজল করছে, খালি পা মেঝেতে নিঃশব্দে বিচরণ করছে। কাছে এসে দুহাতে আমার গাল ধরে মায়ের সুরে বলল :

'তোমার প্রথম অভিজ্ঞতা কোন কুমারী মেয়ের সাথে হওয়া উচিত ছিল—হ্যাঁ তাই। আমার সাথে নয়।'

আমি তাকে কোলে তুলে নিলাম, সে কাঁদতে লাগল।

সে নরমভাবে প্রশ্ন করল, 'তুমি কি বোঝ আমি তোমায় কেমন ভালবাসি, বোঝ না? তোমার সাথে যেমন সুখে আছি, কারো কাছে তেমন সুখে ছিলাম না—সত্যি, বিশ্বাস কর। আগে কখনও এত আপন করে, এত সাবলীল মনে কাউকেই ভালবাসি নি। তুমি ভাবতেও পার না, তোমার সাথে থাকা কত চমৎকার। আর তবুও বলছি, আমরা ভুল করেছি—আমি তোমার যোগ্য নারী নই—তোমার যোগ্য নই। আমি ভুল করেছি।'

আমি তাকে বুঝতে পারছি না। তার কথায় ভয় হচ্ছে। তার মেজাজ ঠাণ্ডা করার জন্য দ্রুত খুশীচিত্ত সোহাগ ও আদরে তাকে ভরে দিতে লাগলাম। কয়েকদিন পরে, ভাবাবেগের অশ্রুভরা চোখে সে আবার বলল:

'আঃ, যদি তুমি আমার প্রথম প্রেমিক হতে!'

মনে আছে সেটা ছিল একটা ঝড়ের রাত; বুনো ঝোপের ডালপালা জানলার কাচে আছড়ে পড়ছিল, চিমনি দিয়ে বেগে বাতাস ঢুকছিল, ঘরটা ছিল অন্ধকার, শীতল এবং ছেঁড়া ওয়ালপেপারের শব্দে ভরপুর।

হাতে কিছু অতিরিক্ত রুবল এলেই আমরা আমাদের বন্ধুদের জমকালো ভোজে আমন্ত্রণ জানাতাম; সেখানে থাকত মাংস, ভদকা ও বীয়ার, প্যাস্ট্রী এবং নানা ধরনের ভাল ভাল খাবার। আমার প্যারিসীয়টির চমৎকার খাদ্য-স্পৃহা ছিল, আর ছিল রুশী খাবারের প্রতি আকর্ষণ—সাইচুগ (বাজরা ও হাঁসের চর্বিভরা গরুর পাকস্থলী); শীটমাছের পুর-দেওয়া মাংসের চপ; আলু-মাংসের স্যুপ।

এক ডজনের মতো বন্ধুর সদস্যপদ-বিশিষ্ট একটি 'পেট-কাটানো-ভোজন' সংস্থা স্থাপন করল সে। এইসব বন্ধুরা আকণ্ঠ ভোজন ও পান করতে পারে। রন্ধন-শিল্প সম্পর্কে এদের জ্ঞান চমৎকার এবং এইসব বিষয়ে তারা সারগর্ভ ও অক্লান্ত ভাষণ দিতে পারে। আমি ভিন্নতর এক শিল্পে উৎসাহী: অল্প খাই এবং খাওয়ানোর ব্যাপারেও অল্পই আনন্দ পাই। এই কিন্তুটা

আমার দার্শনিক উপাদানসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়।

'শূন্য বস্তা'—পেট-ফাটানো-ভোজনকারী ভাইয়ের সম্বন্ধে আমি একবার মন্তব্য করেছিলাম।

সে উত্তরে বলেছিল, "ভাল করে খাঁকিয়ে দেখবে প্রত্যেকেই শূন্য। হাইনে কোথায় যেন বলেছিলেন, 'জামা-কাপড়ের নীচে আমরা সকলেই উলঙ্গ'।"

অনেক সমালোচনাসূচক উদ্ধৃতি জানলেও, আমার ধারণা, সে সবসময় সেগুলো সঠিক প্রয়োগ করতে পারত না।

সে পুরুষদের 'ভালরকম নাড়া দিতে' ভালবাসে আর এই বিষয়ে দক্ষতাও বেশ। যেখানেই যায়, বুদ্ধি ও প্রাণোচ্ছলতার স্পর্শে সবকিছু প্রাণবন্ত করে তোলে এবং যেসব আবেগ সৃষ্টি করে তা কখনই সর্বোচ্চ মানের নয়। তার সাথে কয়েক মুহূর্ত কথা বলার পরই একজন লোকের কান হবে লাল, তারপর গোলাপী, চোখ হবে ছলছলে, এবং এক টুকরো বাঁধাকপি দেখলে ছাগল যেভাবে তাকিয়ে থাকে সেইভাবে জ্বলজ্বলে করে তার দিকে চেয়ে থাকবে।

'চুম্বক-নারী', খাতাঞ্চীর সহকারীটি মন্তব্য করেছিল। খিটখিটে ভদ্রলোক, মুখভর্তি আঁচিল, আর পেটটা যেন চার্চের গম্বুজ।

ইয়ারোস্লাভ থেকে আগত একটি শুভ্র-কেশ ছাত্র তাকে কবিতা লিখে দিত—কবিতাগুলো সবসময়ই ত্রিমাত্রা-ভিত্তিক। ওগুলো আমার খুবই জঘন্য মনে হ'ত অথচ সে হাসতে হাসতে চোখে জল এনে ফেলত।

'তুমি অন্যদের প্ররোচিত কর কেন?' একবার তাকে প্রশ্ন করেছিলাম।

সে উত্তরে বলেছিল, 'এটা মাছ-ধরার মতোই একটা খেলা। একে বলে ছলা-কলা, আর এই পৃথিবীতে আত্ম-সচেতন এমন নারী একজনও নেই যে এতে আনন্দ পায় না।'

কখন সখনও সে ধূর্তের মতো আমার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করত:

'হিংসে হচ্ছে?'

না, হিংসে নয়, তবে বিরক্ত বোধ করছি। নোংরামি আমি সহ্য করতে পারি না। আমি আমুদে লোক। আমার ধারণা 'হাসতে পারা' মানুষের

অন্যতম শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। আমি সার্কাসের ক্লাউন ও মঞ্চের ভাঁড়দের ঘৃণা করি, যদিও এ কথা ঠিক যে আমি তাদের চেয়ে অতি সহজেই অনেক ভাল হাসাতে পারব। প্রায়ই অভ্যাগতদের হাসিয়ে পেট ব্যথা করে দিতাম।

একদিন সে আমায় বলল, 'তুমি চমৎকার কমেডিয়ান হবে। তোমার মঞ্চে ওঠা উচিত, সত্যি গো।'

সে নিজেও শৌখীন নাটকে খুব সুন্দর অভিনয় করেছিল এবং পেশাদার মঞ্চ থেকে আমন্ত্রণও পেয়েছিল।

'মঞ্চ ভালবাসি, কিন্তু মঞ্চের অন্তরাল সম্পর্কে ভয় করে।' সে বলে।

চিন্তায়, কথায় ও বাসনায় সে সত্যনিষ্ঠ।

সে আমায় প্রায়ই বলে, 'তুমি বড় বেশী দার্শনিক। জীবন মূলতঃ নীরস ও সাদামাটা। সুপ্ত উদ্দেশ্যের অন্বেষণ করে একে জটিল করার কোন অর্থ হয় না—আমাদের করনীয় কাজ হচ্ছে তাকে আরও কম নীরস করার চেষ্টা করা। এর বেশী কেউ কিছু করতে পারে না।'

আমার ধারণা, তার দর্শনে বড় বেশী স্ত্রীরোগবিদ্যা ছিল আর 'এ কোর্স ইন অবসট্রেটিক্স', (প্রসূতিবিদ্যা) ছিল তার বাইবেল। সে নিজে একবার আমায় বলেছিল মেয়েদের স্কুল ছেড়ে প্রথম সেই বিজ্ঞানের বই পড়ে সে কেমন ধাক্কা খেয়েছিল।

'তখন এমন নিষ্পাপ ছিলাম যে মনে হয়েছিল কে যেন মাথায় ব্যাট দিয়ে আঘাত করেছে। যেন মেঘ থেকে লাফিয়ে এসে কাদায় পড়েছিলাম, এবং বিশ্বাস হারানোর ফলে কেঁদেছিলাম। কিন্তু অচিরেই বুঝতে পারলাম আমার পায়ের তলায় মাটি বেশ শক্ত হয়েছে, যদিও তা এবড়ো-খেবড়ো। যাঁর জন্য সবচেয়ে বেশী কেঁদেছিলাম তিনি হচ্ছেন ভগবান—তাঁকে খুব আপন করে ভাবতাম এবং হঠাৎ একদিন সিগারেটের ধোঁয়ার মতো তিনি বাতাসে মিলিয়ে গেলেন, আর তাঁরই সাথে সাথে মিলিয়ে গেল আমার প্রেম সম্পর্কীয় আনন্দঘন স্বপ্নরাজী। স্কুলে আমরা প্রেম সম্বন্ধে কত ভাবতাম, কত সুন্দর সুন্দর কথাই না বলতাম!'

আমি তার নৈরাজ্যবাদে বিরূপ হচ্ছিলাম। তার মধ্যে ছিল স্কুল বালিকার সারল্য ও প্যারিসীর উন্মত্ততার এক সংমিশ্রণ। মাঝে মাঝে রক্তের

বেলার ডেস্ক থেকে উঠে ওকে দেখতে যেতাম। বিছানায় তাকে আরও ছোট্ট, আরও সুচারু ও সুন্দর দেখাত। তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম আর জীবনের যে উত্থান-পতন ওর হৃদয়কে জড়িয়ে রেখেছে তার জন্য দুঃখ বোধ করতাম। তার দুঃখে আমার ভালবাসা আরও নিবিড় হয়ে ওঠে।

সাহিত্যের প্রতি আমাদের রুচি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের: আমি বালজাক ও ফ্লবার্ট-এর ভক্ত। আর ও পছন্দ করত পল ফেভাল, অকটেভ ফিউইলেট এবং পল ডি কক। 'ইয়াং জিরাউড, মাই ওয়াইফ' উপন্যাসটি তার বিশেষভাবে ভাল লাগত—ওর মতে, যত বই ও পড়েছে তার মধ্যে এটি সবচেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত। আমার মনে হয়েছিল বইটা অপরাধ-আইনের চেয়েও বিরক্তিকর। এসব সত্ত্বেও বেশ ভালই চলছিল আমাদের। একে অপরের প্রতি বিরক্ত হইনি বা ভালবাসার অভাবও বোধ করিনি। কিন্তু আমাদের দাম্পত্য-জীবনের তৃতীয় বছরে বুঝতে পারলাম যে আমার ভিতরে কিছু একটা অশুভ ইঙ্গিত আন্দোলিত হচ্ছে—এবং ক্রমশ তা আরও বেশী তীব্র আকার ধারণ করছে। সেই সময়ে আমি খুব জোর দিয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছি, খুব গুরুত্ব দিয়েই সাহিত্য রচনা শুরু করে দিয়েছি। অসংখ্য অতিথি এসে আমার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। তাদের অধিকাংশ লোকই বিরক্তিকর। আর তাদের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, কারণ আমাদের রোজগার বৃদ্ধির সাথে সাথে ঘন ঘন মধ্যাহ্নভোজ ও নৈশভোজ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

ওর জীবন হয়ে উঠছে একটা প্রদর্শনী, আর যেহেতু সেইসব অতিথিদের সামনে 'এবার থামুন' গোছের কোন বিজ্ঞাপন ঝুলত না, সে মাঝে মাঝে তাদের খুব কাছে চলে যেত আর তারাও সেটাকে নিজেদের সুবিধা মতো ব্যাখ্যা দিত। ফলে শুরু হত ভুল বোঝাবুঝি যা আবার আমাকেই মিটিয়ে ফেলতে হত। কখনও সখনও খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি, এ ব্যাপারে আমি সর্বদাই অক্ষম; মনে আছে, একবার এক ভদ্রলোকের কান টানায় সে অভিযোগ করে বলেছিল:

'বেশ তো, স্বীকার করছি দোষ হয়েছে, কিন্তু কোন অধিকারে সে আমার কান ধরে টানবে? আমি স্কুলের ছেলে নই! বয়সে ওর দ্বিগুণ, আর সে কিনা আমার কান ধরতে আসে! এর চেয়ে মুখে ঘুঁসি মারলেও

বেশী সম্মানজনক হ'ত।'

আপাতদৃষ্টিতে, যোবীর সম্মানবোধের সাথে সঙ্গতি রেখে শান্তি দেবার রীতিনীতি আমার তেমন জানা ছিল না।

আমার স্ত্রী আমার গল্পগুলো সম্পর্কে খুব বেশী গুরুত্ব দিত না, কিন্তু প্রথম দিকে ব্যাপারটার জন্য কিছু মনে করিনি। আমি নিজেও বিশ্বাস করতাম না যে কখনও লেখক হবো। একথা সত্যি যে মাঝে মাঝে মুহূর্তের প্রেরণা বোধ করতাম, কিন্তু মোটের উপর খবরের কাগজের কাজটাকে আমি নিছকই জীবনধারণের একটি উপায় বলে মনে করতাম। একদিন সকালবেলা আমার সারা রাত্রির পরিশ্রমের ফসল 'বুড়ি ঈজেরগিল' গল্পটা তাকে পড়ে শোনালাম। শুনতে শুনতেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। প্রথমে রাগ করিনি। পড়া বন্ধ করে, চিন্তান্বিতভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার এত প্রিয় আদরের মাথাটা শক্ত সোফার পিঠে এলিয়ে পড়ে আছে। ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক এবং শিশুর মতোই শান্ত কোমলভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে। জানলার উপর বুনো ঝোপগুলোর ফাঁক দিয়ে প্রভাতী-সূর্যের আলো এসে তার বুক ও হাঁটুর উপরে সোনালী রং ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছে—দেখে মনে হচ্ছে যেন স্বচ্ছ কুসুমরাজী।

উঠে বাগানে চলে গেলাম। এখন আমি গভীরভাবে আহত এবং নিজের সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষমতা সম্পর্কেই সন্দেহে ভরপুর।

আবর্জনা, লাম্পট্য, দারিদ্র্য ও গোলামী, অথবা অহংকার, বিকৃতি, অতিভোজনের আত্মতৃপ্তিতে নির্লজ্জতা নারী ছাড়া জীবনে আমি অন্য কোন নারীর সংস্পর্শে আসি নি। শৈশবে একটিমাত্র মনোরম দৃশ্য দেখতে পেয়েছিলাম—সেটা ছিল রাণী মার্গট-এর, কিন্তু অন্যান্য দৃশ্যের পর্বতমালা আমাকে সেই রাণীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। আমার ধারণা ছিল, ঈজেরগিলের জীবন-কাহিনী নারীদের অনুপ্রাণিত করবে, তাদের মনে স্বাধীনতা ও সৌন্দর্যের কামনা জাগ্রত করবে। আর যে নারীটিকে আমি সবচেয়ে বেশী ভালবাসি—সে ঘুমোচ্ছে।

কেন? জীবন আমার হাতে যে অস্ত্র তুলে দিয়েছে তা কি অপর্যাপ্ত? এই নারীটি আমার হৃদয়ে মায়ের আসনটিও দখল করে নিয়েছিল। আমি

আশা ও বিশ্বাস করেছিলাম যে সে আমার সৃজন-ক্ষমতাকে জাগ্রত করতে পারবে এবং বাস্তব-জীবনে আমার মধ্যে যে রুক্ষতা গড়ে উঠেছে তাকে অনেক মসৃণ করে দেবে।

সেটা ছিল তিরিশ বছর আগের ঘটনা, সেই স্মৃতি রোমন্থনে আজ আমার ঠোঁটে হাসি খেলে যায়। কিন্তু সেই সময়ে ঘুম পেলে তার নির্বিবাদ ঘুমিয়ে পড়ার প্রশ্নাতীত অধিকারে আমি যথেষ্ট দুঃখ পেয়েছিলাম।

আমি বিশ্বাস করতাম, বিষণ্ণতা দূর করতে হলে হালকা সুরে কথা বলতে হয়। আমার আরও সন্দেহ ছিল, যে-ব্যক্তি মানুষের দুঃখ-কষ্ট উপভোগ করে, সে মানুষের অন্যান্য বিষয়েও হস্তক্ষেপ করে ঃ সে হচ্ছে শয়তানের আত্মা, সে আজগুবি পারিবারিক করুণ নাটকীয়তা সৃষ্টি করে এবং মানুষের জীবন ধ্বংস করে। এই অদৃশ্য দানবটিকে আমার ব্যক্তিগত শত্রু মনে করে তার ফাঁদ থেকে বাঁচবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্ট করতাম।

মনে আছে, 'সকল অস্তিত্বই যন্ত্রণাক্লিষ্ট', এই প্রবাদটা পড়ে ( ওল্ডেনবার্গের 'বুদ্ধ, তাঁর শিক্ষা ও শিষ্য' গ্রন্থে) আমি ভীষণ বিরক্ত হয়েছিলাম। জীবনে খুব বেশী আনন্দ দেখিনি, কিন্তু আমার মনে হয়েছিল,জীবনে দুঃখ-কষ্ট একটি আকস্মিক ঘটনা, অবশ্যম্ভাবী নয়। এবং বিশপ ক্রিসানথাসের 'ব্রহ্মাণ্ডের ধর্ম' গ্রন্থটি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পড়ে আরও গভীরভাবে নিশ্চিত হয়েছিলাম যে, যে-শিক্ষা দুঃখ, ভয় ও যন্ত্রণাকে জীবনের অমোঘ সঙ্গী করে তোলে সেই শিক্ষার চেয়ে আমার প্রকৃতির বড় শত্রু আর কিছু হতে পারে না। ধর্মীয় ভাবাবেশের মধ্যে বেশ কিছুকাল অবস্থান করে আমি এর অপমানকর নিষ্ফলতা সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। যন্ত্রণাভোগ আমার কাছে এত দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল যে, যেকোন ধরনের নাটকীয়তাকেই ঘৃণা করতাম এবং করুণ নাটকীয়তাকে দক্ষতার সাথে মিলনান্তক করতে শিখেছিলাম।

আমার বাড়িতেই যে একটি পারিবারিক নাটকীয়তা সৃষ্টি হতে যাচ্ছে, এবং আমরা উভয়েই যে তা রোধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করছি, শুধুমাত্র এটুকু বলার জন্য এসব কথার মধ্যে যাবার সম্ভবতঃ কোন মানে হয় না।

আমার প্রকৃত সত্তাকে খ‍ুঁজে বার করার জন্য যে জটিল পথ ধরে আমি ঘ‍ুরে বেড়িয়েছি, সেই পথেরই পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে এইসব দার্শনিক খোড়চাপিকা।

সহজাত প্রাণোজ্জলতার জন্যই আমার স্ত্রীর পক্ষে এই নাটকে অভিনয় করা সম্ভব ছিল না—বহ‍ু 'মনস্তাত্ত্বিক' দ‍ুশী নারী ও প‍ুর‍ুষ ঘরে ঘরে এই খেলাকে ভীষণভাবে উপভোগ করে।

আর এতসত্ত্বেও সেই শ‍ুভ্র-কেশ ছাত্রটির বিষণ্ণ ত্রিমাত্রিক কবিতাগ‍ুলো তার উপরে শরতের ব‍ৃষ্টির মতোই প্রভাব ফেলেছিল। স‍ুন্দর গোল গোল অক্ষরে সে তার নোট-খাতার পাতার পর পাতা ভরিয়ে ফেলত! এবং সেগ‍ুলোকে বইয়ের ভিতরে, ট‍ুপির মধ্যে, এমন কি চিনির পাত্রে পর্যন্ত গ‍ুঁজে দিত। কোন নিখ‍ুঁত-ভাঁজের কাগজ চোখে পড়লেই আমি তা স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে বলতাম :

'তোমার মন-গলানোর এই সাম্প্রতিকতম প্রচেষ্টাটি গ্রহণ কর!'

প্রথম প্রথম কামদেবের এই কাগজের তীরগ‍ুলো তার উপরে কোন ছাপ ফেলত না; সে আমায় কবিতাগ‍ুলো পড়ে শোনাত এবং এইসব লাইন শ‍ুনে আমরা একই সাথে হেসে উঠতাম :

> শ‍ুধ‍ু তোমারই জন্য চিরকাল করি বাস
> আর সব স‍ুখ খ‍ুশী মনে করি ত্যাগ,
> তোমার দেহের উষ্ণতা পাবো বলে,
> প্রতীক্ষা করি, নির্মীলেশ চোখে দেখি,
> (তোমার) চলার ছন্দ, গ্রীবার প্রতিটি বাঁক,
> (মোর) শ্যেন-চোখ ঘোরে কোমল শয্যা পরে…।

কিন্তু সেই ছাত্রটির কাছ থেকে এরকম আর একটি স্বীকারোক্তি পাবার পর সে একদিন চিন্তিতভাবে বলল :

'ওর জন্য দ‍ুঃখ লাগছে।'

কথাটা শ‍ুনে আমি বললাম যে আমিও দ‍ুঃখ বোধ করছি, তবে ওর জন্য নয়। তারপর থেকে সে আমার সামনে তার কবিতা পড়া বন্ধ করে

দিয়েছিল।

কাঁধটি স্বাস্থ্যবান, যুবক—আমার চেয়ে চার বছরের বড়। স্বল্পভাষী, একগুঁয়ে এবং পানাসক্ত। রবিবারের দিনগুলোতে সে দুপুর দুটোর সময় খেতে আসে এবং রাত দুটো অবধি চুপচাপ, স্থিরভাবে এখানে থেকে যায়। সে আমারই মতো অনেক উকিলদের কেরাণী। এমনই আনমনা যে তার তালজ্ঞানহীন মনিবটি পর্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেছিলেন। উপরন্তু সে তার কাজ-কর্মের ব্যাপারেও খুব নির্বিকার এবং প্রায়ই মোটা গলায় মন্তব্য করে বলত ঃ

'যতসব আজেবাজে কাজ।'

'কোনগুলো আজেবাজে কাজ নয় ?'

'হুম···কথাটা কিভাবে বোঝাব ?'

পান্ডুর নিস্তেজ চোখজোড়া ছাদের দিকে তুলে চিন্তান্বিতভাবে উত্তর দিত। কখনই বুঝে উঠতে পারত না কথাটা কিভাবে বোঝাবে। তার একঘেঁয়েমিতে আমি যার-পর-নাই বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। মদ খেত প্রচুর, কিন্তু নেশা হত খুব ধীরে ধীরে, আর যখন নেশা হত বারবার নাক দিয়ে একটি বিচ্ছিরি শব্দ করত। এইসব বিকৃত বৈশিষ্ট্য ছাড়া তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আর কিছুই দেখতে পাইনি, কারণ একটা নিয়মই আছে, কোন স্ত্রীর প্রতি তৃতীয় ব্যক্তি প্রেম নিবেদন করলে তার মধ্যে স্বামী কেবল খারাপ জিনিসগুলোই দেখতে পায়।

ইউক্রেন থেকে কাঁধের এক ধনী আত্মীয় তাকে মাসে পঞ্চাশ রুবল করে পাঠাত—সেই আমলে এই অর্থের মূল্য অনেক। রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিনগুলোতে সে আমার স্ত্রীর জন্য চকলেট কিনে আনত এবং তার জন্মদিনে তাকে একটি এ্যালার্ম ঘড়ি উপহার দেয়—ঘড়িটায় যে মূর্তিটা আছে সেটা হল, একটা দন্ডের উপরে একটি পেঁচা সাপ মারছে। সেই বাজে ঘন্টাটা আমাকে কেবলই এক ঘন্টা সাত মিনিট আগে তুলে দিত।

আমার স্ত্রী ছাত্রটির সাথে ছলাকলা বন্ধ করে দেয়। সে কাঁধটিকে নারীসুলভ কমনীয়তা দিয়ে দেখতে থাকে—কারণ সে মনে করে সে-ই তার মানসিক আবেগজনিত ভারসাম্য নষ্ট করার জন্য দায়ী। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, কিভাবে এই দুঃখজনক ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটবে বলে মনে হয়।

সে বলে, 'জানি না। তার প্রতি আমার নির্দিষ্ট কোন অনুভূতি নেই, কিন্তু তাকে নাড়া দিতে চাই। তার মধ্যে কিছু একটা সুপ্ত অবস্থায় আছে— আমি হয়ত তা জাগিয়ে তুলতে পারব।'

সে নিঃসন্দেহে সাঁচা কথা বলছে। সে সর্বদাই কাউকে না কাউকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিল এবং প্রশংসনীয়ভাবে তাতে সফল হয়েছিল। কিন্তু সে সাধারণতঃ পুরুষের মনে পশুভাবই জাগিয়ে তুলত। আমি তাকে সাধুর গল্প শোনাই, কিন্তু তাতে কোন কাজ হয় না এবং দেখতে পাই, ধীরে ধীরে আমাকে ষাঁড়, ছাগল ও শুয়োরেরা ঘিরে ধরছে।

পরিচিত লোকেরা তার সম্বন্ধে রোমহর্ষক গল্প বলতে শুরু করেছে, কিন্তু আমি জঘন্য রূঢ় ভাষায় তাদের প্রত্যুত্তর দিয়েছি :

'এ ধরনের কথা বললে তোমায় তুলে আছাড় মারব!' আমি বলতাম।

তাদের কেউ কেউ অপমানে সরে পড়ে, কেউবা ক্ষুব্ধ হয়ে।

'রূঢ় ব্যবহার দিয়ে কোনদিনই কিছু লাভ করতে পারবে না। লোকেরা আরও বাজে গল্পই ছড়াবে। তুমি নিশ্চয়ই ঈর্ষান্বিত নও, তাই কি?' আমার স্ত্রী আমায় বলেছিল।

না, আমি খুবই তরুণ ও আত্ম-বিশ্বাসী, তাই ঈর্ষান্বিত। কিন্তু এমন কিছু চিন্তা, অনুভূতি ও সমস্যা আছে যা মানুষ তার প্রেমাস্পদ নারী ছাড়া আর কাউকেও বলতে পারে না। মধুর আলাপনের মুহূর্তগুলোতে সে নিজের হৃদয়কে সেই নারীর কাছেই সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দেয় যে তারই ঈশ্বরে বিশ্বাসিনী। আর যখন ভাবলাম যে কোন এক ঘনিষ্ট মুহূর্তে অন্য কারো কাছে সে আমার এই একান্ত নিজস্ব বিষয়গুলো প্রকাশ করে দিতে পারে, আমি বেপরোয়া হয়ে উঠলাম; বুঝতে পারলাম এ হচ্ছে বিশ্বাস-ঘাতকতা। সম্ভবতঃ সকল ঈর্ষার ভিত্তি হিসাবে এই সন্দেহই কাজ করছে।

বুঝতে পারলাম, যে-জীবন আমি যাপন করছি তা কাঙ্ক্ষিত পথ থেকে আমায় সরিয়ে দিতে পারে। ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরে গেছি, সাহিত্য-সেবাই হবে আমার সার্বিক সাধনা। কিন্তু এ রকম পরিস্থিতিতে সে সাধনা অসম্ভব।

জীবন থেকে আমি এই শিক্ষা পেয়েছি যে, দোষ-ত্রুটী নিয়েই মানুষকে

গ্রহণ করতে হবে—তাদের প্রতি সম্মান বা আগ্রহ হারালে চলবে না। এই শিক্ষার বলেই আমি ছিলাম ঋণী, কোন পারিবারিক নাটক সৃষ্টি করা থেকে বিরত। আমি দেখেছি সকল মানুষই চিরন্তন-সত্য নামক অচেনা ভগবানের কাছে অল্প-বিস্তর অপরাধী, এবং প্রতিটি ব্যক্তিই নিজের ন্যায়-বোধের কাছে যতখানি অপরাধী, মানুষের কাছে ততখানি নয়। আত্ম-ন্যায়-বোধ হচ্ছে ভয়ংকর অস্বাভাবিকতা। যা পাপ-পুণ্য-বোধের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে। আর এই পাপ-পুণ্য-বোধ গড়ে উঠেছে আইনসঙ্গত বিবাহের মধ্যে দিয়ে—হিংসা ও ধর্ষণের মধ্যে দিয়ে নয়—যার পুরোহিত হিসেবে কাজ করে সেই আপাত-নিস্বার্থ প্রয়োজন। বিবাহ এমনই একটি রহস্য, যার মধ্য দিয়ে দুটো বিপরীত চরিত্র মিলিত হয়ে প্রায় সব সময়ই একটি নীরস মাখামাখি অবস্থার সৃষ্টি হয়। শিশু যেমন বরফ ভালবাসে, তেমনি আমিও সেই সময়ে রহস্যময়তা ভালবাসতাম। রহস্যময়তার উজ্জ্বলতা আমাকে দামী মদের মতোই উত্তেজিত করত। আর কথার রহস্যময়তাকে ব্যবহার করা হয় বাস্তব ঘটনার ক্রূর ও বেদনাদায়ক রহস্যময়তাকে লাঘব করার জন্য।

'আমার মনে হয়, আমার চলে যাওয়াই ভাল,' স্ত্রীকে বললাম।

উত্তর দেবার আগে সে একটু ভাবল।

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। এ জীবন তোমার ভাল লাগছে না, আমি বুঝতে পারছি।'

দুজনেই কিছুক্ষণ বিষণ্ণ ও নীরব হয়ে রইলাম। তারপর আমরা আলতোভাবে আলিঙ্গন করলাম এবং আমি শহর ছেড়ে চলে গেলাম। তার কিছু পরে সেও চলে গেল এবং অভিনয়ে যোগ দিল।

আর এই হচ্ছে আমার প্রথম প্রেমের কাহিনীর পরিসমাপ্তি—একটি করুণ পরিসমাপ্তি ঘটলেও, কাহিনীটি আনন্দদায়ক।

কিছুদিন হ'ল সে মারা গেছে।*

---

* গোর্কি ভুল করেছিলেন। ১৯২৮ সালের ১৪ই এপ্রিল, কামিন্‌সকায়ার কন্যা ও ইভিনা-আলাকোভাকে লিখিত একটি পত্রে তিনি তাঁর ভুলের কথা বলেন: '১৯২৮ সালে অ্যামেরিকার একটি চিঠিতে জেনেছিলাম ওলগা নিমোনিয়ায় মারা গেছে।

'আজ একটা চিঠি থেকে জানলাম যে তোমরা দুজনেই ভাল আছ, তবে তোমাদের আর্থিক সংকট চলছে। যদি তোমাদের আপত্তি না থাকে এবং আমার সাহায্যের কথায় তুমি বা ও. ওরাই রাগ না কর, তবে আমি তোমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করতে ইচ্ছুক।'

তার পক্ষের উল্লেখযোগ্য দিক হল, সে ছিল প্রকৃতই একজন নারী। সে জানতো প্রাত্যহিক জীবনকে কিভাবে নিতে হবে, অথচ তার কাছে প্রতিটি দিনই ছিল ছুটির দিনের প্রাক্কাল। সব সময়ই তার প্রত্যাশা ছিল, আগামীকাল পৃথিবীতে নতুন নতুন, মনোহর ফুল ফুটবে, চমৎকার মানুষজন দেখা দেবে এবং অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটবে।

জীবনের কষ্টকে সে উপহাস ও অবজ্ঞা করত, মশার মতো বিতাড়িত করত। যে কোন ভাল জিনিসেই প্রাণোজ্জ্বল বিস্ময় প্রকাশ করার জন্য সে প্রস্তুত হয়ে থাকত। সেটা স্কুলের মেয়ের অকৃত্রিম প্রাণোচ্ছ্বাস নয়; সেটা ছিল এমনই একজন ব্যক্তির প্রাণবন্ত আনন্দ যে জীবনের বর্ণবহুল পরিবর্তন-সমূহ, মানব-সম্পর্কের অম্ল-মধুর জটিলতা, সূর্য-রশ্মির-মধ্যে-ছিটকে-পড়া ধূলোকণার মতো প্রাত্যহিক ঘটনাপ্রবাহকে ভালবাসে।

সে-যে মানুষকে ভালবাসত, এ কথা আমি বলতে পারি না, কিন্তু তাদের পর্যবেক্ষণ করতে ভালবাসত। প্রায়ই সে স্বামী-স্ত্রী বা প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে জমে-ওঠা নাটককে ত্বরান্বিত অথবা মন্দীভূত করে চলত। এর জন্য কারও মনে জাগিয়ে তুলত ঈর্ষা আবার কারোও মনে বাড়িয়ে তুলত মোহাবেশ। এই বিপজ্জনক খেলায় সে বেশ মেতে উঠেছিল।

সে বলত, 'ক্ষুধা ও ভালবাসা পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করে আর দর্শন তা ধ্বংস করে। ভালবাসার জন্যই মানুষ বেঁচে থাকে—এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'

আমাদের পরিচিতদের মধ্যে ছিল একজন ব্যাংকের কেরানী। লোকটা রোগা ও ঢ্যাঙা—বকের মতো ধীর, অহংকারী লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটে। পোষাক নিয়ে তার ছিল খুঁতখুঁতে বাই। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাড়-জির-জিরে আঙুল দিয়ে কোটের ময়লা ঝাড়ত। অবশ্য সে ময়লা সে ছাড়া আর কেউ দেখতেই পেত না। যেকোন মৌলিক ভাবনা-চিন্তা বা ভাবব্যঞ্জক কথায় সে ছিল শত্রু; তার জড়-জিহ্বায় ওসবের বালাই ছিল না। ধীরে ধীরে গুছিয়ে কথা বলত। আর তার প্রিয় সত্য কথাগুলো বলার সময় সে অবশ্যই নিষ্প্রাণ আঙুলগুলো দিয়ে পাতলা, লাল গোঁফ জোড়া টেনে টেনে সোজা করত।

'কাঁচামালকে শিল্পের উপযোগী করার প্রক্রিয়ায় ক্রমশঃ রসায়ন বিজ্ঞান ক্রমশঃই বেশী বেশী গুরুত্ব লাভ করবে। এ কথা ঠিক যে নারীরা খামখেয়ালি। স্ত্রী ও প্রেয়সীর মধ্যে শারীরিক কোন পার্থক্য নেই—পার্থক্য রয়েছে কেবল আইনগত।'

একবার আমার স্ত্রীকে বেশ ভাবগম্ভীরভাবে বলেছিলাম: 'তুমি কি এখনও মনে কর যে সব সরকারী কর্মচারীরই ভালা আছে?'

সে গম্ভীর ও অপরাধীর মতো বলেছিল:

'ওহ্ না, তা নয়, কিন্তু আমার মতে হাতিকে অম্ল-লেবু ডিম খাওয়ানো অবাস্তব।'

মিনিট দুয়েক আমাদের এইভাবে কথা বলতে শুনে বন্ধুটি বেশ গম্ভীরভাবে মন্তব্য করেছিল:

'আমার মনে হয় তোমরা গুরুত্ব দিয়ে কথা বলছ না।'

আর একবার হাঁটুতে টেবিলের পায়ায় বেশ আচ্ছারকম আঘাত খেয়ে সে প্রত্যয়ের সাথে বলেছিল:

'ঘনত্ব বস্তুর একটি প্রশ্নাতীত গুণ।'

কোন এক সন্ধ্যায় তাকে দরজায় দেখেই আমার স্ত্রী আমার হাঁটুর উপরে ঝুঁকে পড়ে খুশীতে গদগদ হয়ে বলে উঠল:

'কি নিরেট আস্ত হাঁদারাম লোকটা! আস্ত হাঁদারাম—চলায়…বলায়…সব কিছুতে! অদ্ভুত চালচলনের জন্যই ওকে আমার ভাল লাগে। গালে একটু হাত বুলিয়ে দাও।'

তার মিষ্টি চোখের নীচে যে অস্পষ্ট বলিরেখা দেখা দিচ্ছিল, সে চাইত আমি সেখানে আলতো করে আঙুলের ডগা বুলিয়ে দিই! বেড়ালছানার মতো আমার গা ঘেঁসে বসে সে আদুরে গলায় বলত:

'লোকজন কি চমৎকার রকম আকর্ষণীয়, অন্যের কাছে যে লোকটা পুরোপুরি বিরক্তিকর সেও আমার কৌতূহল জাগাতে পারে। বাক্সের ভেতর যেভাবে উঁকি মারি সেভাবেই তার দিকে তাকাতে পারি—হয়ত এমন গোপন কিছু পেয়ে যাই যা অন্যেরা কখনও আবিষ্কার করতে পারে নি, আমিই প্রথম তা দেখি।'

তার 'আবিষ্কারের' অনুসন্ধানে কোন কৃত্রিমতা ছিল না ; কোন অদ্ভুত ঘরে কোন শিশু প্রথম ঢুকে যেমন খুশী ও অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠে, তেমনভাবেই সে অনুসন্ধান করত। কখনও সখনও কারো অবাক চোখে চিন্তার দ্যোতি আনতে সক্ষম হলেও সে বেশীরভাগ সময়ে তাকে পাবার কামনাই জাগ্রত করত।

সে নিজের দেহের প্রশংসা করত, আয়নার সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে বলত :

'কি সুন্দর করেই না নারীদেহ তৈরী। শরীরের প্রতিটি রেখা কি ছন্দোবদ্ধ!'

এবং আবার বলত :

'ভাল পোষাক পরলেই নিজেকে বেশী শক্তিশালী, স্বাস্থ্যবতী ও বুদ্ধিমতী মনে হয় আমার।'

কথাটা সত্যি : একটা সুন্দর ফ্রক পরলেই তার বুদ্ধি ও প্রফুল্লতা বেড়ে যেত, চোখে খেলত বিজয়িনীর ঠমক। সাধারণ ক্যালিকো কাপড় থেকে সুন্দর সুন্দর ফ্রক বানাবার দক্ষতা ছিল তার। খুবই সাদামাটা পোষাক, অথচ তা রাজকীয় ঠাট এনে দিত। অন্যান্য মহিলারা ওগুলো দেখে হাসিতে ফেটে পড়ত—তবে সবসময়ই গুরুত্ব দিয়ে নয়, কিন্তু উচ্চস্বরেই হাসত। তারা হিংসা করত তাকে এবং আমার মনে আছে তাদের একজন বেশ রুক্ষভাবে বলেছিল :

'আমার গাউনটা তোমার চেয়ে তিনগুণ দামী অথচ দশ ভাগের এক ভাগও সুন্দর নয়। তোমাকে দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়।'

মহিলারা যে তাকে অপছন্দ করবে ও তার সম্বন্ধে গুজব ছড়াবে এতো স্বাভাবিক। একজন মহিলা ডাক্তার, যেমন রূপসী তেমনই বোকা, আমাকে একবার বলেছিল :

'ঐ মেয়েলোকটা তোমার রক্ত চুষে শেষ করে দেবে।'

প্রথম প্রেম থেকে আমি অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করেছি, তবুও আমাদের মাঝে যে দুর্ভেদ্য কুয়াশা দেখা দিয়েছিল, তা আমাকে যন্ত্রণাদগ্ধ করে।

আমি জীবনকে অত্যন্ত গর্বের দিয়ে গ্রহণ করেছিলাম, দেখতাম অনেক, চিন্তা করতাম আরও বেশী এবং সদা চঞ্চলতার মধ্যে বেঁচেছিলাম। একরাশ কর্কশ কণ্ঠস্বর সর্বদা আমার দিকে এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিত যে সে অপদার্থ।

বাজারে একদিন দেখেছিলাম একটা পুলিশ একজন সুন্দর একচোখা বুড়ো ইহুদিকে ধরে পেটাচ্ছে। বুড়োটার অপরাধ, সে একটা ফেরিওয়ালার মুলো চুরি করেছে। আমি বৃদ্ধটিকে দেখছিলাম, জামাকাপড় ধুলোয় ভরা, ধীরে আত্মসম্মানের সাথে হেঁটে চলেছে যেন পটে-আঁকা ছবি, তার আরক্ত চোখটি তপ্ত মেঘহীন আকাশের দিকে তোলা, মুখের কোণ থেকে রক্তের সরু ধারা নেমেছে তার লম্বা সাদা দাড়িতে।

সেই থেকে তিরিশটি বছর পার হয়ে গেছে, অথচ আজও তার সাদা ভুরুর কাঁপন ও আকাশ-পানে-তোলা চোখের নীরব প্রতিবাদ দেখতে পাই। মানুষের প্রতি অবমাননা ভোলা খুবই কঠিন—আর কখনও যেন তা ভোলা না হয়!

আমি হতাশ মনে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম, ক্রোধ ও হতাশায় হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল। সেই অভিজ্ঞতা আমার মনে এই পৃথিবীর প্রতি ঘৃণা জাগ্রত করেছিল। মনে হয়েছিল যে আমি এই পৃথিবীতে একজন বহিরাগত, এখানকার যা কিছু নীচ, ঘৃণ্য, অর্থহীন ও ভয়ঙ্কর, মানবাত্মার কাছে যা কিছু অপমানকর সেসব আমাকে দেখিয়ে আমার উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। ঠিক সেই সময়েই আমার ও আমার প্রেয়সীর মধ্যেকার বিরাট ফারাক সম্পর্কে আমি সবচেয়ে বেশী সচেতন হয়ে উঠি।

আমার মনের কথা তাকে বলতেই সে ভীষণ বিস্মিত হয়েছিল।

'এই জন্য তোমার মনের এই অবস্থা? তোমার স্নায়ু দেখছি খুবই দুর্বল!' তারপরই বলল, 'কি বললে? লোকটা সুন্দর? যার একটা চোখ নেই সে কিভাবে সুন্দর হবে?'

যেকোন যন্ত্রণাই তার কাছে অসহনীয়; কোন লোক দুর্ভাগ্য নিয়ে আলোচনা করলে সে সহ্য করতে পারত না, ছন্দোবদ্ধ কবিতায় সে মুগ্ধ হ'ত না; এবং কদাচিৎ সে গভীর মানবিক সহানুভূতি প্রকাশ করত। তার প্রিয় কবিদের একজন হলেন হাইনে, যিনি নিজেই যন্ত্রণাকে উপহাস করতেন, এবং দ্বিতীয়জন বেরাঙ্গার।

জাদুকরের প্রতি শিশুর যেমন মনোভাব, জীবনের প্রতি তারও মনোভাব ছিল সেইরকম অর্থাৎ জাদুকরের সকল খেলাই মজাদার, কিন্তু সবচেয়ে মজার খেলাটা এখনও ঝোলায় আছে। খেলাটা সে হয়ত কাল বা পরশু নাও দেখাতে পারে, কিন্তু একদিন না একদিন দেখাবেই।

আমি বিশ্বাস করি মৃত্যুর মুহূর্তেও সে সেই শেষ, সবচেয়ে বিস্ময়কর এবং উল্লেখযোগ্য খেলাটা দেখবার আশা করেছিল।

অসীম সমুদ্র। দূরে থেকে মনে হয় আলস্যে গা এলিয়ে নিশ্চিত তন্দ্রাসুখ উপভোগ করছে। নীল চাঁদের আলোয় তার সর্বাঙ্গ সিক্ত। রাজকীয় মাধুর্য্য নিয়ে সমুদ্রটা দক্ষিণ দিগন্তে আকাশের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। জলের নীচে ভাসছে পেঁজা তুলোর মত জমাটবাঁধা মেঘ। তাকে ঘিরে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে মণিমাণিক্যের মত উজ্জ্বল নক্ষত্রের ভিড়। ছোট ছোট ঢেউগুলো পরস্পরের সঙ্গে ফিসফিসিয়ে কী সব আলাপ করছে। সমস্ত আকাশটা যেন ঝুঁকে, আড়ি পেতে তা শোনবার জন্য সচেষ্ট।

এদিকের পর্বতগুলোর আপাদ-শীর্ষ জঙ্গলে ঢাকা। তাদের মাথায় লেগে আছে অন্ধকারের কোমল মধুর স্পর্শ

ধ্যানমগ্ন পর্বতপুঞ্জের কালো ছায়া দিয়ে সমুদ্রের সফেন, সবুজ ঢেউগুলোর শরীর সর্বাঙ্গ মোড়া। যেন তারা জলে-জলে ভাঙনের শব্দকে, সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাসকে একেবারে স্তব্ধ করে দিতে চায়। স্বাভাবিক! চাঁদ যে এখনও পাহাড়ের দেয়াল ডিঙিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে নি।

'আল্লা হো আকবর।' নাদির রাজিম ওগলি মৃদু স্বরে ধ্বনি তুলল। নাদিরের বয়স হয়েছে। ক্রিমিয়ায় সে একটা আস্তাবল দেখা-শোনা করে। লম্বা, মাথায় ধবধবে সাদা চুল, গায়ের চামড়া রীতিমত রোদে সেঁকা। পাতলা গড়নের একজন জ্ঞানী বৃদ্ধ এই নাদির।

একটা উঁচু পাথরের চাঁই-এর পাশে বালির উপর আমরা দু'জন শুয়ে ছিলাম। কালো ছায়া অনেকটা দীর্ঘ হয়ে পাথরের ওপর পড়েছে। বিধ্বস্ত বিবর্ণ এই পাথরটি হয়ত কোন এক কালে পাহাড় থেকে খসে এখানে পড়েছিল। পাথরটির গা জুড়ে ছোপ ছোপ শ্যাওলা। শরীরের একাংশে বহুদিন ধরে গজিয়ে ওঠা কিছু সামুদ্রিক লতা যেন পাথরটিকে বালির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখতে চাইছে। আমাদের তাঁবুর আগুনের শিখায় সমুদ্রতট উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মাটিতে ঝিলমিল করছে তাদের লকলকে ছায়া। যেন ভাঙনের রেখাচিত্র দিয়ে মাটিতে আল্পনা আঁকা হচ্ছে।

রাজিম, আমি কয়েকটা মাছ ধরে আগুনে সেঁক করছিলাম। আমাদের

দু'জনের মেজাজই ভীষণ প্রফুল্ল। আশপাশের সব কিছুই বেশ জীবন্ত, সুন্দর ও সহজ হয়ে উঠেছে। আমাদের মনে কোন ভার ছিল না, ঝরঝরে নির্মল, স্বচ্ছ। শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখে সময় কাটাতেই তখন আমাদের সবচেয়ে ভালো লাগছিল।

সমুদ্রটা বালির বুকে মুখ গুঁজে নিশ্চিন্তে পড়ে আছে। ঢেউগুলোর গোঙানি শুনে মনে হ'ল তারা যেন আমাদের আগুনের উত্তাপের কিছুটা অংশ প্রার্থনা করছে। সেই গোঙানি ছাপিয়ে একটা সুন্দর, মিষ্টি নাটকীয় সুর দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের কানে ভেসে আসছিল। খুব সম্ভব তা আমাদের পায়ের কাছে আছড়ে পড়া ঢেউ-এরই আর্তনাদ।

শুয়ে থাকা রাজিমের দৃষ্টি সমুদ্রের দিকে। কনুই অনেকটা বালিতে ডোবা, মাথাটা সযত্নে দুটো হাতের ওপর রাখা। নির্বিঘ্ন চিত্তে দূরে তাকিয়ে আছে রাজিম। টুপিটা মাথার পেছন দিকে হেলানো। ভেড়ার চামড়ায় তৈরী ওটা। বিশুদ্ধ বাতাস তার বলিরেখা সহজ, প্রশস্ত, ঋজু কপালে আলতো চুমু খেয়ে যাচ্ছে। দেখে মনে হয় আপাততঃ সে কিছু দার্শনিক চিন্তায় বিভোর। হঠাৎ সে বকতে শুরু করল। আমি শুনছি কি শুনছিনা, তার বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই। ভাবটা এই যেন সমুদ্রের সঙ্গে বাক্যালাপ হচ্ছে! 'যে পবিত্র বিশ্বাস নিয়ে আল্লার সেবা করে সে বেহেস্তে যায়। কিন্তু যে আল্লা বা নবীর সেবা করেনা তার পরিণতিটা কী? হয়তো সমুদ্রের বুকে ওরকম ফেনা হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়! হয়তো ওরাই জলে রুপোর মত চিকচিক করছে? কে জানে!'

চাঁদের আলো সমুদ্রের বুকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ায় অন্ধকার এখন অনেকটা হাল্কা। পাহাড়ের পেছন থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা চাঁদ বিস্তীর্ণ বেলাভূমিতে আলো ছড়াচ্ছে। পাথরটাকে ঘিরে যে অন্ধকার এতক্ষণ ছিল, এখন তাও তেমন নেই।

আমি বন্ধুকে বললাম, 'রাজিম, একটা গল্প শোনাও।' সে মাথা না ফিরিয়েই প্রশ্ন করল, 'কেন?'

'কেন আবার কি? তোমার গল্প শুনতে আমার ভালো লাগে তাই।'

'আমি যা গল্প জানি তার সবই তোমায় বলেছি। আর ত জানি নে।'

রাজিমের ইচ্ছে, আমি তাকে একটু খোসামোদ করি—করলামও।

সে রাজী হয়ে বলল,'যদি চাও তবে একটা গান তোমায় শোনাতে পারি।'

তার পুরোণো গানের প্রায় সবকটাই আমার খুব ভালো লাগে। তাই প্রস্তাব শুনে ভীষণ আনন্দ পেলাম।

লোকসঙ্গীতের কদর ধরে রাখবার জন্য রাজিম বেশ খেলিয়ে খেলিয়ে একটা গান গাইতে আরম্ভ করল।

অনেকটা উঁচু দিয়ে একটা সাপ বুকে হেঁটে হেঁটে পাথরটার শেষ প্রান্তে এল। এসে মাথা নীচু করে তাকিয়ে রইল সমুদ্রের দিকে।

তখন মাথার ওপরে সূর্য জ্বলছে। পাহাড়ের উত্তপ্ত নিশ্বাস ভূমণ্ডল ছাড়িয়ে ক্রমশ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আর তখন নীচে একটার পর একটা ঢেউ পাথরের ওপর অবিশ্রান্ত শব্দে আছড়ে পড়ছিল।

পাথরের মাঝখানে হাঁ-করা অংশটা দিয়ে অন্ধকার কুয়াশা ভেদ করে একটা নদী বয়ে চলেছে। সমুদ্রে নামবার সময় স্রোতের বেগ এত বেশী যে তাতে অনেক পাথরই সমূলে উৎপাটিত হয়।

জমাট ফেনাপুঞ্জের আঘাতে নদী পাথর কাটে এবং ক্রুদ্ধ গর্জন করতে করতে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে।

হঠাৎ একটা বাজপাখী চিৎকার করতে করতে আকাশ থেকে নীচে নেমে এল। নেমে সাপটা যেখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে সেখানে দাঁড়াল। তার পাখা দুটো রক্তাক্ত এবং বুকে একটা ক্ষত।

মাটিতে নেমেই পাখীটা ভয়ংকর জোরে আর্তনাদ করে উঠল। এবং এমন মরিয়া হয়ে পাখার ঝাপট দিতে লাগল যে সাপটা ভয় পেয়ে খানিকটা সরে এল। কিন্তু চকিতেই বুঝতে পারল পাখীটাকে ভয় পাবার কিছু নেই। ওর অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়। মিনিট কয়েকের মধ্যেই ওটা মরবে।

সুতরাং সে নির্ভয়েই পাখীটার কাছাকাছি গিয়ে কুণ্ডলী পাকালো। এবং তার কানের কাছে হিসহিসিয়ে বলল, 'খুব শীগ্‌গিরই তুমি মরছ।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দিল পাখীটা, 'হ্যাঁ, আমার হয়ে এসেছে। কিন্তু আঃ—বেঁচে থাকা কাকে বলে তাতো জানা হল। আর সুখ? তার

স্বাদও পেয়েছি। অবশ্য এর জন্য লড়াইও কম করতে হয় নি। সমস্ত আকাশ জুড়ে আমি উড়েছি—কেবল উড়েছি। কিন্তু তোমাকে দেখে আমার দুঃখ হচ্ছে। বেচারা! তুমি ত কোনদিনও আমার মত অসীম আকাশ দেখতে পাবে না।'

'আকাশ? সে আবার কি? আমার ওসবের কোন প্রয়োজন নেই! ওখানে কি আমি এভাবে কুন্ডলী পাকিয়ে আরামে পড়ে থাকতে পারতাম? তার চেয়ে এই আমার ঢের ভালো।'

সাপটি স্বাধীনচেতা বাজপাখীটিকে এইসব বলে চলল। পাখীটির এইসব বীরদর্পে আত্মকথন শুনে মনে মনে বিদ্রূপের হাসিও তার কম পেল না।

ভাবতে লাগল নিজের মনে, 'কেউ উড়ুক না হামাগুঁড়ি দিক কী এসে যায় তাতে? সবারই শেষ পরিণতি এই মাটির আশ্রয়।'

হঠাৎ পাখীটা মাথা নীচু করে নিজের বুকের ক্ষতর দিকে চাইল।

পাথর চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল পড়ছে। বায়ুমন্ডল ততক্ষণে মৃত্যু ও ধ্বংসের আতঙ্কে ভারী।

যন্ত্রণায় পাখীটি আর্তনাদ করে উঠল।

'আঃ, আকাশে উড়ে বেড়ানোটা যে কী মজার, স্বাধীন! আর একবার—আর একটিবার যদি উড়তে পারতাম!' হঠাৎ তার সমস্ত শরীরটা কঠিন হয়ে উঠল, 'ধরব, ধরব, শত্রুকে আমি ধরবই। তারপর তার মাথাটা আমার এই বুক দিয়ে থেঁতলে দেব! আঃ, যদি শত্রুর রক্ত দিয়ে জায়গাটা একবার ধুয়ে দিতে পারতাম! লড়াই—লড়াই···লড়াই ছাড়া কোথাও সুখ নেই।'

সাপটা মুহূর্তের মধ্যে ভেবে ঠিক করে ফেলেছে যে আকাশ-বিহারের ভাবনাটা মোটেই কাজের নয়। পাখীটার ওপর যথেষ্ট বিরক্তও হল সে। বড্ড গন্ডগোল করছে!

পাখীটিকে বলল, 'যাও না এই খাড়া পথটা বেয়ে আর একটু ওপরে উঠে যাও। তারপর ছুঁড়ে দাও নিজেকে। হয়তো তোমার পাখা এখনও তোমায় উড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে। সত্যি, আকাশ বলে কথা!'

পাখীটি খুব উত্তেজনায় সময় কাটাচ্ছে। ইচ্ছে করেই চেঁচাল সে।

সবাই যেন শুনতে পায়। ঢোঁড়ার মনে মনে একটু গর্বও হোল। তারপর হঠাৎ হামাগুঁড়ি দিয়ে খাড়া পথটা বেয়ে উঠতে লাগল।

শেষপ্রান্তে পৌঁছে সে তার পাখা দুটোকে যতটা সম্ভব ছড়িয়ে দিল। তারপর অনেকটা লম্বা করে একটা শ্বাস ফেলে উজ্জ্বল চোখ মেলে অনন্ত আকাশের দিকে তাকাল।

হঠাৎ পাথরটা নীচে গড়িয়ে পড়ল। সেই সঙ্গে পাখীটাও। এবং তার ডানা দুটো ভেঙে গেল।

একটা ঢেউ এসে তার শরীরের সমস্ত রক্ত মুছে দিয়ে গেল। সর্বাঙ্গে তার ফেনা। পরের ঢেউটা তাকে টেনে-হেঁচড়ে সমুদ্রে নিয়ে গেল।

পাথরে ভেঙে যাওয়া শোকসন্তপ্ত ঢেউ পাখীটাকে যে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল, বিপুল, বিস্তীর্ণ সমুদ্রের দৃষ্টিসীমায় আর তাকে দেখা গেল না।

( ২ )

অনেকক্ষণ যাবৎ সাপটি ঐ গর্তের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রইল আর ভাবতে লাগল পাখীটির মৃত্যুর কথা। আকাশের জন্য কী ভীষণ ভালোবাসাই না তার ছিল।

তারপর একসময় সে চোখ তুলে মাথার ওপর আকাশের দিকে তাকাল— ওখানেই তো এক চঞ্চল, অস্থির চিত্ত-সুখের খোঁজ পেয়েছিল।

'কিন্তু বেচারা পাখীটি কি করে ওখানে সুখের খোঁজ পেল? ঐ মহাশূন্যতার মধ্যে? উঃ! এই হতভাগারা নিজেরাও উন্মাদ, আর উন্মাদনা দিয়ে অন্যের শান্তিও কেড়ে নেয়। ওখানে আছেটা কী? আর যদি কিছু থাকেও তার জন্য সামান্য কিছুদূরে উড়ে এলেই যথেষ্ট।'

নিজের মনে মনে বিড়বিড় করতে করতে সাপটা আরও কঠিন পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে নিজেকে বাঁধল। তারপর লাফ দিল সেই শূন্যতার মধ্যে। যখন সাদা, জ্বলন্ত সূর্যের মধ্যে কালো আঁকাবাঁকা রেখা ঝলসে উঠল।

কিন্তু যারা সরীসৃপ তারা কোনদিনও উড়তে পারে না। সাপটাও না। ধপাস করে পাথরের উপর পড়ল।

অমনভাবে পড়েও তার হাসি পেল।

'উড়ে বেড়ানোর মজা তাহলে এই ! পতনের সুখ ! উঃ, পাখীগুলো কি মূর্খ' । মাটিতে সুখ পায় না, তার জানেনা বলেই পাখনা মেলে আকাশে উড়তে চায়—ঐ বিস্তীর্ণ মহাশূন্যে বাস করতে চায় ! শূন্য ছাড়া ওটা আবার কি ? অফুরন্ত আলো অবশ্য আছে কিন্তু শরীরের কোন কাজেই তা লাগে না। তবে বাপু এত অহংকার কেন ? আর এত বিদ্রুপই বা কিসের ? এগুলো হল ওদের উন্মাদনা এবং জীবনযাত্রার অসংগতিকে জনসমক্ষে আড়াল রাখার একটা কৌশলমাত্র ! উদ্ভট এক পাখী ! আর বাপু তোমার কথায় ভুলছি না ! অনেক ফাঁকি দিয়েছ । তোমাকে বুঝতে আর আমার বাকী নেই । আকাশ ত' দেখলাম । আমিও গিয়েছিলাম ওখানে । কিন্তু কী হোল ? ওখান থেকে পড়লাম নীচে । যদিও প্রাণে বেঁচে গিয়েছি ! এই সব শক্তিমানেরা দেখছি আমার আত্মবিশ্বাস ক্রমশই বাড়িয়ে দিচ্ছে । থাক্, মাটিকে যারা ভালোবাসে না, তারা থাক ঐ আকাশের মোহে । ওসব পাখী-টাখীদের আস্ফালনকে আর কখনও সমীহ করছিনা । শালা জন্মেছি যখন মাটিতে, মাটিতেই থাকব ।'

এইসব আওড়াতে আওড়াতে সাপটা আবার পাথরের ওপর কুণ্ডলী পাকালো । তার বুকের ছাতি এখন অনেকটা ফুলে উঠেছে আত্মতৃপ্তিতে ।

সমুদ্র রুপালী আলোয় ঝলমল করছে । এবং ক্রুদ্ধ ঢেউগুলো ভীমগর্জনে তীরে আছড়ে পড়ছে ।

সেই সিংহগর্জনের মধ্য দিয়ে বাজপাখীটির গান ভেসে আসতে লাগল । ঢেউ-এর আঘাতে কেঁপে উঠল পাথরগুলো । সঙ্গীতের ঝঙ্কারে আকাশ কম্পিত ।

'এক ক্ষ্যাপা দুঃসাহসীর উদ্দেশ্যে আমরা একটা গান গাইছি ।'

'দুঃসাহসীদের উন্মাদনাই হচ্ছে জীবনে একমাত্র সত্য । হে বীর ! তুমি শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে রক্ত ঝরিয়েছ । কিন্তু এমন দিন আসবেই যখন তোমার রক্তের প্রতিটি বিন্দু জীবনের বিষন্নতার মধ্যেও চিরউজ্জ্বল হয়ে থাকবে । এবং সমস্ত দুঃসাহসীদের অন্তরে অরুণোদয় ও স্বাধীনতার আগুন জ্বালিয়ে দেবে ।'

'তুমি তোমার জীবন দিয়ে সব ঋণ শোধ করেছ । কিন্তু সমস্ত যোদ্ধার রণসঙ্গীতের মধ্যে তুমি বেঁচে থাকবে । বেঁচে থাকবে স্বাধীনতা ও

অন্নপোষকের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।'

'এসো আমরা সবাই ওই বেপরোয়া দুঃসাহসীর উদ্দেশ্যে একটা গান গাই।'

...সমুদ্র এখন শান্ত। ঢেউ-এর মৃদু গুঞ্জন ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই। আমি চুপ করে সামনের দিকে যথাসম্ভব দৃষ্টি প্রসারিত করে রইলাম। জ্যোৎস্না ঘন হয়েছে। সমুদ্রের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এখন জ্যোৎস্না খেলা ক'রছে। কানে ভেসে আসছে কেটলীর মৃদু নিঃশ্বাসের শব্দ।

একটা ঢেউ রাজিমের মাথার কাছে এসে আছড়ে পড়ল। রাজিম উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল,

'ফিরে যাও। কোথায় যাবে ভাবছ?'

রাজিম হাত নাড়ল। ঢেউগুলো বাধ্য ছেলের মত ঘুরে ঘুরে ফিরে গেল।

সমুদ্রের তরঙ্গমালায় রাজিম জীবন-দর্শন খুঁজে পেল। আমি অবশ্য তার মধ্যে মজার বা চমকপ্রদ কিছুই পাই নি। আমাদের ব্যাপার-স্যাপার অদ্ভুত রকমের সজীব, স্বতস্ফূর্ত, অবিচল এবং প্রীতিকর ছিল। নীরব সমুদ্রের বুক চেয়ে ঠান্ডা বাতাস পাহাড়ের মাথাগুলো আলতো করে ছুঁয়ে যাচ্ছে। কেন যেন মনে হল সেখানে এক অদ্ভুত শান্তি আছে। নীল অন্ধকার আকাশের বুকে নক্ষত্রেরা এমন এক পবিত্র বাণী খুঁজে পেয়েছে যা আত্মাকে সমৃদ্ধ করে। হৃদয়কে কোনো কাঙ্ক্ষিত বাণীর জন্য উন্মুখ করে তোলে।

সবকিছুই কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন। অথচ বেশ সচেতন। যেন সবাই জেনে গেছে যে এমন একটা মুহূর্ত অচিরেই আসবে যখন সবাইকে গা ঝাড়া দিয়ে বসে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইতে হবে। সেই গান, সেই সুর জীবনের রহস্যের কথা বলবে, ব্যাখ্যা দিয়ে মনের সব জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়িয়ে দেবে এবং আত্মাকে ঐ নীল মহাকাশের দিকে ধাবিত করবে। ওখানে সমস্ত নক্ষত্ররাই সর্বদা মধুর, স্বর্গীয় সঙ্গীত গায়।